বিচ্ছিন্ন উত্তর ! ‘ম্যানমেড বন্যা’ আলিপুরদুয়ারে ?

বন্ধ দার্জিলিং চা উৎপাদন
বিপর্যয় আসন্ন

গরিবের ইউনিফর্ম
সাজু তালুকদার

এখন ডুয়ার্স

১-১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭। ১২ টাকা

বানভাসি তবু বিন্দাস

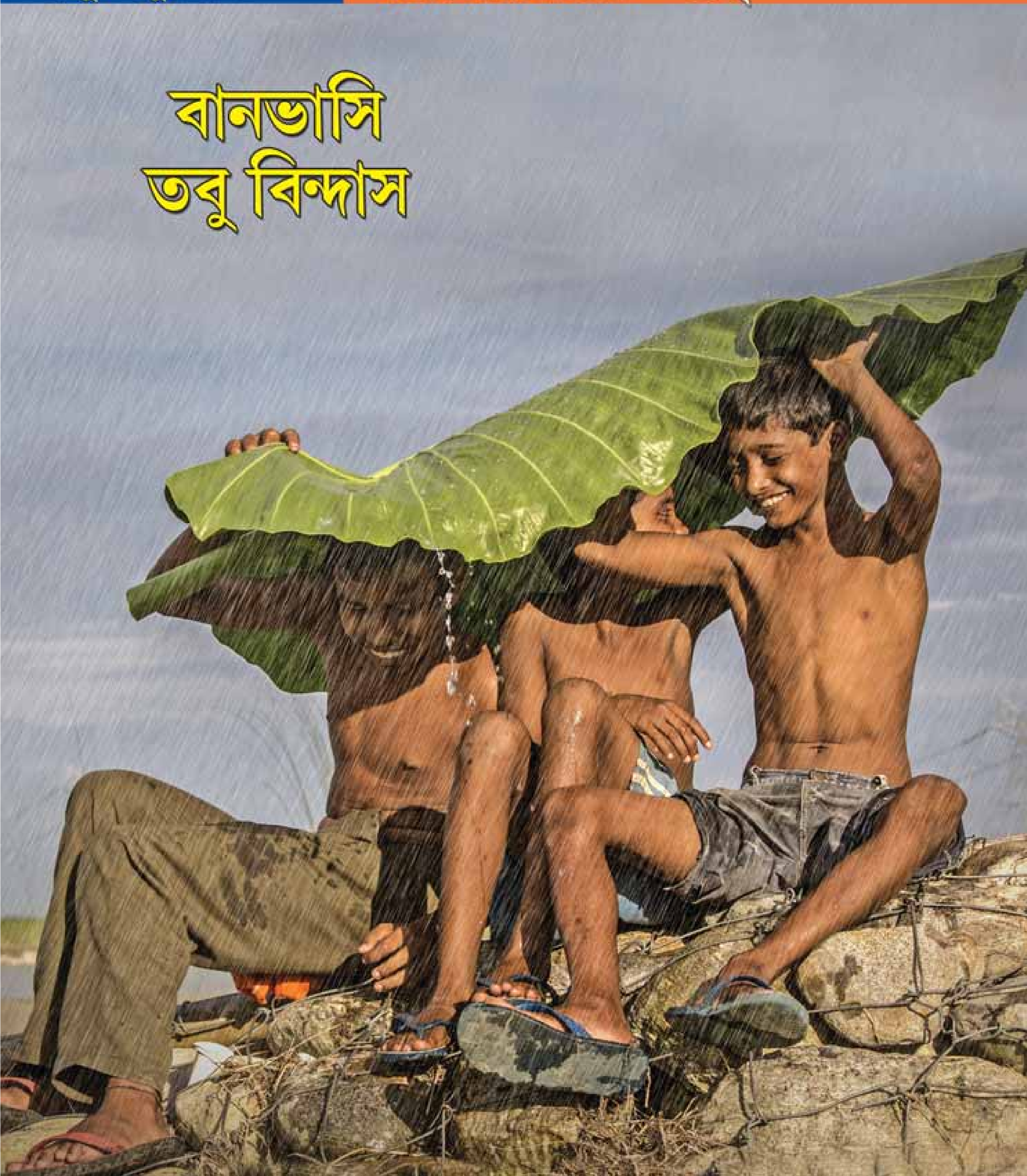

অত্যাধুনিক জীবনযাত্রা আমাদের জীবনকে অনেক স্বাচ্ছন্দ্যময় করে দিয়েছে, কিন্তু তার সাথে অনেক অসুখও এনে দিয়েছে।
তার মধ্যে **কোষ্ঠকাঠিন্য** অন্যতম................

কোষ্ঠকাঠিন্য এড়াতে ৪ টি টিপস্ ঃ-

১. প্রচুর জল খান, প্রতিদিন অন্তত ৩ লিটার।

২. দৈনন্দিন খাবারে ফাইবারযুক্ত খাবারের মাত্রা বাড়ান।

৩. মশলাদার খাবার এড়িয়ে চলুন।

৪. রোজ অন্তত ৩০ মিনিট শরীর চর্চা করুন।

Issued for the public interest by **Pharmakraft**

From the makers of :

PICOME Susp.

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

আর কিছু দিনের মধ্যেই মহালয়া। পুজোর ছুটিতে বেড়াতে আসুন জলপাইগুড়িতে। করলা নদীর ধারে কাটিয়ে যাওয়া যেতেই পারে কয়েকটা দিন। নদীর ধার ধরে বেড়াবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটি তৈরি করেছে বাঁধানো বসবার আর সপরিবারে আড্ডা মারবার জায়গা। মন ভাল করার আর নির্জনতা উপভোগ করার উপযুক্ত স্থান। জলপাইগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি শহরের মানুষের জন্য তো বটেই, পর্যটকদের জন্যও সদা দায়িত্বশীল।

শ্রীমতী পাপিয়া পাল
উপ-পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রী মোহন বোস
পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

কফি হাউস ? ক্লাবঘর ?
নাকি আরও অনেক কিছু ?

চা-টা। আড্ডা। দাবা-ক্যারম-টেবিল টেনিস। পার্টি। গেট টুগেদার।
সেমিনার। বেড়াতে যাওয়ার বইপত্র ও বুকিং।

সোম-শনি বেলা ১ টা থেকে রাত ৯টা।

ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭

পরিচালনায় NEST SOCIETY (Regn. No. S/2L/5822 of 2013-14)

আড্ডাঘর

মুক্তা ভবনের দোতলায়, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি - ৭৩৫১০১

ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭

যে কেউ সদস্য হতে পারেন। যে কেউ যোগ দিতে পারেন।

এককালীন সদস্য নেওয়া হচ্ছে

সম্পাদকের ডুয়ার্স

রেল লাইন জুড়ে শুধু শূন্যতা

এগারো অগস্ট মধ্যরাতে গভীর ঘুমের মধ্যে শেষবারের মতো পার হয়ে এসেছিলাম সেই নড়বড়ে সেতু, যা তারপর দিন থেকেই ট্রেন চলাচলের অবস্থায় রইল না। বানভাসি ডুয়ার্সের নানা প্রান্তে ছুটে যেতে যেতে খেয়ালই ছিল না তার কথা। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুভব করলাম দু'দিন পরেই সঙ্গে কলকাতা থেকে আসা 'হোম সিক' বন্ধুটিকে ফেরৎ পাঠাতে গিয়ে। রাতে মালদা থেকে গৌড় এক্সপ্রেসের কনফার্মড টিকিট। সকাল সকাল গাড়ি ভাড়া করে কোচবিহার থেকে রওয়ানা করিয়েও মালদার রাতের ট্রেন ধরাতে রীতিমত হিমশিম। কোথাও হাইওয়ের ওপর ডিভাইডারের একদিকে বইছে হাঁটুর ওপর দিয়ে জল, অন্যদিকে নীচু প্লাবিত এলাকা থেকে উঠে আসা কাকভেজা গ্রামবাসী। কোথাও আটকেপড়া মালবাহী লরির সুদীর্ঘ লাইন, আর উলটো দিক থেকে আসা কোনও লরি হড়কে হাইওয়ে থেকে নীচু কাদামাটিতে আটকে। স্তব্ধ হয়ে আছে শয়ে শয়ে গাড়ি। গাড়িতে বসে বসে জীবন যন্ত্রণা ভোগ করা ছাড়া আর উপায় নেই।

নিউ জলপাইগুড়ি- নিউ মাল- নিউ কোচবিহার-নিউ আলিপুরদুয়ারের মতো দিনভর ব্যস্ত স্টেশনের চেহারা দেখলে মনে হয় যেন দেশে হঠাৎ কোনও জরুরি অবস্থা বা কার্ফু জারি হয়েছে। স্টেশনের আশপাশের মানুষ পক্ষকাল হয়ে গিয়েছে ট্রেনের আওয়াজ শুনতে পান না। মালবাহকরা ইতিউতি ঘাপটি মেরে ঘুমোচ্ছে বা গুলতানি মারছে। স্টেশন চত্বরে নেই ভিড়, হকারের আওয়াজ, যেন কোনও শয়তানের জাদুকাঠিতে ভো ভা, শ্মশানের নীরবতা পালন করা হচ্ছে । এ জিনিস ডুয়ার্সের মানুষ এর আগে কবে দেখেছে বা আদৌ ঘটেছে কিনা তা বলতে পারছেন না কেউই। এক হতাশাময় শূন্যতা যেন রেললাইন বেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত, উৎসব মরশুমের প্রাক্কালে হতাশার এমন ব্যাপকতা ডুয়ার্স-তরাইয়ে আগে কখনও প্রত্যক্ষ করা যায়নি।

যেমন দেখা যায়নি বন্যা ঘিরে তেমন কোনও রাজনৈতিক চাপানউতোর, যা অবাক করার মতো বৈকি। কলকাতা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মালদা পেরিয়ে আসবার সময়-সুযোগ করে উঠতে পারেননি, অতএব বাকিরা যেন সবাই ছুটির মেজাজে। প্রথম দিকে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার সচিত্র ও বিচিত্র সব সেলফি ফেসবুকে দেখা গিয়েছে অহরহ। তারপর সে সব উধাও। দেখা গেল এবার তেনারা মেতে উঠেছেন ফুটবল টুর্নামেন্ট আর গণেশ পুজোয়। এমনিতে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে থেকে থেকেই হুংকার ছাড়ছে দল, অথচ বিচ্ছিন্ন রেল যোগাযোগকে দ্রুত চালু করার দাবিতে কোনও মিছিল বা অবস্থান আন্দোলন দেখা গেল না। অবাক করার মতো বিষয় নয় কি? উত্তরের সাংসদ-বিধায়ক-মন্ত্রীরা বার বার কলকাতা-দিল্লি উড়ে উড়ে গেলেন নানা মিটিং করতে অথচ একবারও সরব হলেন না এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ে কোচবিহার থেকে বিমান না হোক অন্তত মালদা পর্যন্ত জরুরি হেলিকপ্টার সার্ভিসের দাবিতে। যাতে পুজোর মুখে নিরুপায় ব্যবসায়ী বা ইন্টারভিউতে ডাক পাওয়া চাকুরি প্রার্থী কিংবা মরতে বসা রোগী এই দুর্যোগে কিঞ্চিৎ সুবিধাপ্রাপ্ত হতে পারতেন। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ এই সময় যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে পরিস্থিতির মোকাবিলার, কিন্তু উত্তরের নেতা-মন্ত্রীদের কোনও চেতনার উদয় হয়েছে বলে মনে হয়নি। অথচ দিদি একবার এপথে পা বাড়ালেই হত, দেখা যেত এককে জনের তৎপরতা এবং তার 'যথাযথ প্রচার'!

বছরের পর বছর একই রকমভাবে অবহেলা পেতে পেতে গা সওয়া হয়ে গিয়েছে উত্তরের মানুষগুলোর। অন্তত বাকি পৃথিবী তো সেরকমই ধরে নিয়েছে। আর নেতারা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোন কারণ তারা জানেন, ভোট যখন এমনিই পাওয়া যায় তখন অযথা মাথা ব্যথা করার কোনও মানে নেই। গত দিন কুড়ির রেলওয়ে ট্র্যাক জুড়ে শূন্যতা আসলে পিছিয়ে পড়া এই উত্তরের তক্‌দির চিত্র।

চতুর্থ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ১-১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স ৫

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

দেড় মাস ধরে বন্ধ দার্জিলিং চায়ের উৎপাদন সংকট যে আসন্ন তা কি বলার অপেক্ষা রাখে? ৮

নতুন রঙের পোঁচ জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে! 'কারিগরি মেধা কাজে লাগুক উত্তরের উন্নয়নে' ১৩

'ম্যানমেড বন্যা' আলিপুরদুয়ারে? ২৩

উত্তরপক্ষ ২০

বিচ্ছিন্ন উত্তর ও নিরবচ্ছিন্ন ভোগান্তি এই অবহেলার উত্তর কারও জানা আছে?

কেজো মানুষের কাহিনি

গরিবের 'ইউনিফর্ম' সাজু ৩৪

ধারাবাহিক ডুয়ার্স

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ১৬

তরাই উৎরাই ২৯

লাল চন্দন নীল ছবি ২৬

ডুয়ার্স থেকে শুরু ৩১

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস ৪৭

নিয়মিত বিভাগ

খুচরো ডুয়ার্স ৬

ডুয়ার্সের ডায়েরি ৪২

খেলাধুলায় ডুয়ার্স ৩৭

সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স ৪৪

শ্রীমতী ডুয়ার্স

ডুয়ার্সের ডিশ ৩৮

মালবাজার শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাবের ৭১তম স্বাধীনতা দিবস পালন ৩৮

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

মাদক নেশা থেকে মুক্তি পাওয়ার তীব্র আর্তি থেকেই সৃষ্টি 'সঞ্জীবনী' ৪০

দেশি না ব্রয়লার? ৪১

প্রচ্ছদ ছবি: দেবাদ্রি সরকার, জলপাইগুড়ি ফোটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন

সম্পাদনা ও প্রকাশনা প্রদোষ রঞ্জন সাহা
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদনা শ্বেতা সরখেল
অলংকরণ শান্তনু সরকার
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
ইমেল ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

খুচরো ডুয়ার্স

ছদ্মপদ্ম

ধুন্ধুমার বৃষ্টিতে কী হবে কী হবে করে ধূপগুড়ির পুরভোট দিব্যি হয়ে গেল। আর সে ভোটের ফল দেখে তো মামা পাবলিক কিঞ্চিৎ থ! ঘাসফুলের সঙ্গে কী লড়াইটা দিল পদ্মফুল। নয় নয় করে এক গন্ডা সিটেও ফুটিয়ে দিল কোকনদ! আরও যে দু'খানা দল সে নির্বাচনে ছিল, তারা অবশ্যি সিনেই নেই। লড়াই হয়েছে যাকে বলে ফুলে-ফুলে। তাতে এক ফুল বাজিমাত করলেও আরেক ফুল রৌপ্যপদক পেয়ে পাবলিককে 'ফুল' বানিয়ে ছেড়েছে। তারপর থেকে নাকি বড় দাদাদের-ভাইদের মধ্যে জোর কলহ। সুগন্ধিদাদা নাকি দায়িত্ব দিয়েছিলেন আলালদাদাকে। তাঁকে নাকি বেশ দু'ঘা বসিয়ে দিয়েছে ভিন্ন দাদার ভাইয়েরা। কেউ বলছে, তারা বুদ্ধদাদার ভাই। কেউ বলছে সূর্যদাদার। সব মিলিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছিল গো! এখন নাকি জোর মিটিং হচ্ছে ছদ্মবেশী পদ্মদের খুঁজে বার করার জন্য। আলালবাবুকে নাকি তারাই 'হেনস্থা' করেছিল সে দিন। বিশ্বাস হচ্ছে গো কত্তা?

ফিশ সন্ধ্যা

মানে সন্ধে হলেই ফিশ ধরতে বেরিয়ে পড়া। নিদারুণ বরিষনের পর এখন ডুয়ার্সে জলের অভাব নেই। আর সে জলে অভাব নেই ফিশেরও। কত্ত পুকুর-ডোবা বৃষ্টিতে উপচে পড়ছিল, তার কি হিসেব আছে রে ভাই! চার দেয়ালের মধ্যে বিশ্ব-দেখা ফিশের দল সেই সুযোগে বেরিয়ে পড়েছিল ডুয়ার্স ঘুরতে। জল নেমে যাওয়ায় আশ্রয় নিয়েছে হেথা হোথা। তদুপরি ছোট ছোট নদী টইটম্বুর। ফলে ডুয়ার্সের গেরামগঞ্জে মাছের বাজার লাটে। তা তো হবেই কাকা! সন্ধে হলেই যে রকমারি ফিশ কিলিং ডিভাইস নিয়ে জল-ময়দানে নেমে পড়ছেন গেরস্তরা। ঘণ্টা দেড়-দুই পর ফিরে আসছেন ঝুলি ভরতি করে। সেসব টাটকা ফিশ খেয়ে রাতে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে তোফা ঘুম। এরপর মর্গের মৎস্য কিনবে কোন পাগল? আর সে মৎস্যই বা আসছে কোথায়? বন্যায় রেল আর রাস্তা ভোগে গিয়েছে, জানেন না?

পেটে পূণ্য

তা দেবতার সেবায় নিয়োজিত যখন, তখন পুণ্যি তো হবেই। হচ্ছেও। কিন্তু কলিযুগ বলে কথা গুরুদেব! পুণ্যিতে তো পেট ভরে না। তাই শুকনো পুণ্যি নিয়ে বেজায় শুষ্ক মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কোচবিহার দেবোত্তর ট্রাস্টের কর্মীরা। শোনা যাচ্ছে, কাজের বিনিময়ে পুণ্য দেওয়ার কাজটা দেবতারা নিয়মিত করেন ঠিকই, কিন্তু মানি দেওয়ার দায়িত্ব নাকি পর্যটন বিভাগের। সে বিভাগ হাত গুটিয়ে উদাস মুখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকায় বেতন ব্যাপারটা নাকি মাঝে মাঝেই ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে। পুজো আসছে। মানুষের দেওয়া বেতনেই না দেবতার পুজো হবে! এই যে পুজোয় নতুন জামা-জুতো কেনা তা কি মানুষের দেওয়া বেতন বিনে সম্ভব? রামায়ণ-মহাভারতের যুগ হলে না হয় সেসব স্বর্গ থেকেই বৃষ্টির মতো নেমে আসত, কিন্তু ঘোর কলিতে কেবল বৃষ্টিই নামে স্বর্গ থেকে। সুতরাং ভারী চিন্তা। হায়! দেবতার কাজ করেও বেতন নাই! দেশে হিন্দুধম্ম কি তবে লোপ পেয়ে গেল গো?

কাণ্ড 'কার' খানা

কী কাণ্ড, কন তো কত্তা! শিলিগুড়ি মহকুমা বলে কতা। তার পরিষদের সভাপতি কি এলেবেলে ব্যাপার হল গো? কিন্তু দেকো দিকি কাণ্ড! সভাপতির কিনা চড়ার মতো গাড়ি নেইকো! আপিস একখানা গাড়ি তাঁকে দিয়েছে বটে, কিন্তু সে গাড়িকে কেউ তেল দিচ্ছে না গো! মানে বিল না মেটালে অয়েলিং করতে রাজি নয় পাম্প। তারপর দেখো, গাড়ির বিমার কাগজ লাটে উঠেছে, পলিউশনে ডাহা ফেল, গোদের উপর বিষফোড়ার মতো ডেরাইভারজিও নাকি অসুস্থ। তবে? সভাপতিরই যদি এই দুর্দশা, তবে পরিষদের কী হাল গো কত্তা! ভাবতেই খিদে পেয়ে যাচ্ছে! সব শুনে গমেন্টের উঁচু উঁচু লোক নাকি বলছেন, আহা! বেচারার জন্য একটা সুস্থ গাড়ি যে দেওয়া যাচ্ছে না, সেটা কে না জানি আমরাই! কিন্তু কেন দেওয়া যাচ্ছে না, সে প্রশ্ন করিসনে পাগলা! জবাব জানি না।

মাহুত বন্ধু রে

গানে যেমন বলা হয়েছিল, ডুয়ার্সে ঠিক তা-ই হচ্ছে, বুঝলেন? একবার গেইলেক কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধু রে? মাহুত গেলে আর আসছেন না। কালের নিয়মে মাহুত রিটায়ার করে চলে যাচ্ছেন, কিন্তু নয়া মাহুত আর আসছেন না। ফলে গোলমেলে সমস্যায় পড়েছে পাঁচ ডজন কুনকি হাতির মালিক ডুয়ার্সের বন বিভাগ। কুনকিদের কি কাজের অভাব? পর্যটক পিঠে নাও! মালপত্তর বও। সেতুহীন দুর্দান্ত নদী বর্ষাকালে পার হও! বিদ্রোহী হাতিকে জব্দ করো! মস্তান গন্ডারকে সহবত শেখাও— কাজের তো অন্ত নেই কাকা! কিন্তু হাতি চালায়েগা কৌন? মাহুতদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য একটা ইশকুল নাকি বানানো হবে লাটাগুড়িতে। সব ঠিকঠাক। কেবল পয়সা নেই। ফলে মাহুতও নেই। তা নেই নেই করেও যাঁরা আছেন,

তাঁরা ঘরের ছেলেদের ট্রেনিং দিচ্ছেন নিজের মতো করে। কিন্তু মাহুত বন্ধু এইভাবে আর কতদিন 'আসিবেন', সেটাও ভাবো মামা! দেড়শো কোটির দেশে হাতি মোটে হাজার তিন-চার। মাহুত বন্ধু কি আসিবেন না?

বরাহ, কড়া হ

পুর কাউন্সিলর একজন বলেছেন, অভিযানের সময় র‍্যাফ আর কমব্যাট ফোর্স যেন রেডি থাকে। তা তিনি কি গুন্ডাদল দমনের কথা বলছেন? নাকি চিন আক্রমণ করেছে জলপাইগুড়ি পুর এলাকা? না হে! অত ভাবার দরকার নেই। অভিযান হবে বরাহ গ্রেপ্তারের জন্য। সেই কবে থেকে টাউনে পুরবাসীর সঙ্গে পুরবরাহ ঘুরে বেড়ায়, তা কি আর আমরা জানিনে? সেই বরাহবাহিনী গ্রেপ্তারের জন্যই র‍্যাফ আর কমব্যাট ফোর্স দরকার। কিন্তু কেন মামা? বরাহরা কি সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করে, নাকি পুলিশকে তাক করে পাটকেল ছোড়ে? না না! তারা তো বরাহনন্দন মাত্র। কিন্তু তাদের ধরলেই কিছু পাবলিক নাকি হা রে রে শব্দে তেড়ে এসে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বরাহদের। তাই ভয়ে আর অভিযানে যেতে চাইছে না কেউ। এ নিয়ে খুব ধুন্ধুমার তক্কাবিতক্ক হওয়ার পর নাকি ভাবা হচ্ছে র‍্যাফ আর কমব্যাট ফোর্স। দরকারে আর্মি, এমনকি সুখোই নিয়ে আসা হবে হাসিমারা থেকে।

টুক্রাণু

নাবালকে বাবাকে হুইলচেয়ারে ঠেলছে দেখে ধুন্ধুমার সরগরম জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে। কারা জানি ঘুমন্ত মহিলাদের চুল কেটে নিয়ে যাচ্ছে ডুয়ার্সের কোথাও কোথাও। দিনহাটায় আড্ডাবাজদের জায়গা বানিয়ে দিচ্ছে গম্মেন্ট। জলের ঠেলায় ডুয়ার্সে গাছে উঠে বসে আছে বহু সর্প। কী করে জানি এনজেপি-তে তেল চুরি 'কট রেড হ্যান্ডেড' করে ফেলেছে পুলিশ। শিলিগুড়িতে তিন দিন নিরম্বু থাকার ব্যবস্থা করেছিল প্রশাসন। মালদা টু রায়গঞ্জ—ত্রাণ না পেয়ে 'দাদা'দের খুব ঠেঙাচ্ছে পাবলিক। আলতাগ্রামে উদ্ধার অত্যাহত সর্পকে ভরতি করা হল মিন্টুবাবুর হাসপাতালে। বন্যায় খুশির ঢল ডুয়ার্সের নৌকো শিল্পে। তুফানগঞ্জে জোড়া বাঘের আনাগোনা, কিন্তু পায়ের ছাপ খুব ছোট। রাজগঞ্জে দুর্গা ঠাকুর বানানো হচ্ছে উল দিয়ে। বিমল গুরুং নাকি এক ডেরায় দু'রাত্রি থাকছেন না।

বালুরঘাটে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার হলে—যেতে চাইলে লেগে পড়ুন।

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি
৯৪৩৪৩২৭৩৪২
শিবমন্দির
অনুপ দাস ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
মালবাজার
সম্রাট (হোম ডেলিভারি)
৯৩৩২০০৫৮৬৫
চালসা
দিলীপ সরকার ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল
৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
লাটাগুড়ি
সৌমেন (হোম ডেলিভারি)
৯০০২৪০৯৮৯৩
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৪৩৪৪১২৬৪৯
আলিপুরদুয়ার
সুদীপ্ত (হোম ডেলিভারি)
৮৬০৯০৮৮৯০৭
কোচবিহার
সার্থক পণ্ডিত (হোম ডেলিভারি)
৭০০১২৬৩২৮৬
জয়ন্ত দাস ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
৯৮৫১২৩৪৮৮৯
মাথাভাঙা
নেপাল সাহা (হোম ডেলিভারি)
৮৯৬৭৯৯৫৮৮৭
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি
৯৯৩২৯৬৭৯৯১
রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার ৯৪৩৪৪২৩৫২২
বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
০৩৩-২২৫২৭৮১৬

মকাইবাড়ি টি এস্টেট, দার্জিলিংয়ের ৮৭টি বাগানের মধ্যে সেরার সেরা

দেড় মাস ধরে বন্ধ দার্জিলিং চায়ের উৎপাদন সংকট যে আসন্ন তা কি বলার অপেক্ষা রাখে?

দেশীয় বাজারে পুরানো যেটুকু মজুত আছে তা দিয়ে হয়ত আরও মাসখানেক টেনেটুনে চলে যাবে। তারপরই দেখা দেবে সমস্যা। কেবলমাত্র সেন্টিমেন্ট বা গুণমান দিয়ে আজকের প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকা কঠিন। পরিস্থিতি একই রকম চলতে থাকলে এতদিনের তৈরি বাজার খোয়ানোর সম্ভাবনা প্রবল। আর এই সম্ভাবনা আরও ভয়ংকর রূপ নিতে পারে বিদেশের বাজারে, যেখানে প্রতিযোগীরা সবসময়ই ওত পেতে বসে থাকে হঠিয়ে দেওয়ার যাবতীয় ছলাকলা নিয়ে। এক ইউরোপের বাজারে বিক্রি হয় প্রায় ৫৫ হাজার কেজি দার্জিলিং চা। সেখানকার তাবড় ক্রেতা সংস্থাগুলো সেই চা এবার না পেলে কি তাদের ব্যবসা গুটিয়ে বসে থাকবে? একেই প্রাকৃতিক বিরূপতা, তার উপর ভরা মরশুমে লাগাতার বন্ধ— বলাই বাহুল্য, দার্জিলিং চা-শিল্প বিপর্যয়ের মুখোমুখি। আসন্ন যে সংকট সবাই অনুমান করছেন তা সরেজমিনে দেখতে এই হরতালের বাজারেই দার্জিলিং সফরে গিয়েছিলেন **ভীষ্মলোচন শর্মা**। সেই প্রতিবেদন এবার তাঁর ধারাবাহিকের ২৩তম পর্বে।

অশান্তির কালো মেঘে ছেয়ে আছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ছোট একটি জেলা দার্জিলিং। ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে তিন দিনের জন্য এসেছি দার্জিলিং। তবে প্রকৃতির বিমুখতা এবং বিমল গুরুঙের নির্বুদ্ধিতা— উভয়সংকটে দার্জিলিং পাহাড়ের 'সবুজ সোনা'। বিশ্ববিখ্যাত দার্জিলিং চায়ের এই সংকট স্বাধীনতা-উত্তরকালে আগে কখনও দেখা যায়নি। অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটে অচল হয়ে পড়েছে দার্জিলিং, বিপর্যস্ত জনজীবন, পর্যটকহীন শহর, শিল্প কারখানা, স্কুল-কলেজ, হাটবাজার, যানবাহন চলাচল বন্ধ। এলাকায় ঢোকার পথ রুদ্ধ। তীব্র খাদ্যসংকট। ছোট্ট পাহাড়ি জেলা দার্জিলিং ৩,১৪৯ বর্গকিমি বিস্তৃত। পর্যটন এবং চা-শিল্পকেন্দ্রিক এই জেলার অর্থনীতি। জেলার জনসংখ্যা ১৮,৪৬,৮২৫। ৮৭টি টি এস্টেট দার্জিলিঙে। ১৭,৫০০ হেক্টর জমিতে এই চা জন্মায়। বাৎসরিক গড় উৎপাদন ৯ মিলিয়ন কেজি। জেলার ৫০ শতাংশ মানুষ

চা-শিল্পের সঙ্গে জড়িত। জেলার দ্বিতীয় শিল্প পর্যটন।

কথা হচ্ছিল কলকাতা টি ট্রেডারস অ্যাসোসিয়েশন-এর সেক্রেটারি কল্যাণ সুন্দরমের সঙ্গে। কল্যাণবাবু জানান, বিশ্ব জুড়ে দার্জিলিং চায়ের যেমন সুনাম, তেমন চাহিদা। কিন্তু গত ১২ জুন থেকে যেভাবে দার্জিলিঙে পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়েছে, তাতে এই আন্দোলনের ফলে দার্জিলিং চা বাজার থেকে উধাও হয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রভূত। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যসহ বিদেশেও প্রচুর পরিমাণ দার্জিলিং চা রপ্তানি হয়ে থাকে। কিন্তু প্রায় দেড় মাস ধরে বন্ধ দার্জিলিং চায়ের উৎপাদন। বর্তমানে শিলিগুড়িসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে যে পরিমাণ দার্জিলিং চা মজুত রয়েছে, তাতে খুব বেশি হলে আর এক মাস বাজারের চাহিদা অনুযায়ী জোগান দেওয়া যেতে পারে। উত্তরবঙ্গ চা উৎপাদন সংস্থার উপদেষ্টা প্রবীর শীলের মতে, দার্জিলিং চায়ের জোগান কমে আসার ফলে এই অবস্থা চলতে থাকলে পুজোর আগেই শিলিগুড়ির বাজারে দার্জিলিঙের চা মিলবে না। দার্জিলিঙে আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে ৮৭টি চা-বাগানে স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ রয়েছে। ফলে কোনও বাগানই চা তৈরি করতে পারেনি। আগামী ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে পাহাড়ের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে উৎপাদন শুরু হতে পারছে না। কল্যাণ সুন্দরমও একই কথা সমর্থন করে জানালেন, গত মরশুমের অবিক্রীত চা দিয়ে বর্তমান সংকট মেটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চাহিদা সামাল দেওয়া যাবে। এর মধ্যে চলমান পরিস্থিতি স্থিতিশীল না হলে সংকটে পড়বে সামগ্রিকভাবে পর্যটন এবং চা-শিল্প। বিশ্বব্যাপী চাহিদা থাকলেও সরবরাহ সংকটে পণ্যটির দাম বাড়বে এবং অধরা হয়ে উঠবে দার্জিলিং চা। নর্থ বেঙ্গল এক্সপোর্টারস অ্যাসোসিয়েশন-এর সভাপতি তপন দাসের মতে, শিলিগুড়ি শহরে ১৪১টি হোটেলে অধিকাংশ পর্যটক দার্জিলিং এবং সিকিম ভ্রমণের জন্য ঘর ভাড়া নেয়। ফলে শহরের হোটেলগুলিতে এই ধর্মঘটের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে।

চলমান আন্দোলন ও অচলাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাজার হারাতে বসেছে দার্জিলিং চা। অগাস্টের শেষ সপ্তাহে সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও শ্রমিক সংকটে পণ্যটির দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎপাদন বা 'সেকেন্ড ফ্লাশ' মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যে পরিমাণ চা সংগ্রহ করা হয়েছে, বনধের কারণে তা-ও বাজারে সরবরাহ করতে পারেননি ব্যবসায়ীরা। দার্জিলিঙের গুডরিক গ্রুপের চা-বাগানের অন্যতম পদস্থ কর্তা এএন সিংহ জানান, চলমান পরিস্থিতির কারণে এবারই প্রথম জুন মাসব্যাপী চা উৎপাদন পুরোপুরি বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছেন উৎপাদনকারীরা। কিছু কিছু বাগান থেকে সামান্য পরিমাণ চা সংগ্রহ করা সম্ভব হলেও তা বাজারজাত করা যায়নি। তাই আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যটির দাম কয়েকগুণ বেড়ে যেতে পারে আগের বছরের তুলনায়। এএন সিংহর মতে, উৎপাদনের দ্বিতীয় পর্যায়ে মোট চায়ের ২০ শতাংশ সংগ্রহ করা হয়। তবে এ জন্য পণ্যটির দামও বেশি। পাশের রাজ্য অসমে উৎপাদিত সাধারণ চা যেখানে প্রতি কেজি ১৩০ টাকাতে (২ ডলার ১ সেন্ট) বিক্রি হয়, সেখানে দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতি কেজি দার্জিলিং চায়ের গড় দাম ১ হাজার টাকা অর্থাৎ ১৫ ডলার ৪৫ সেন্ট। গুণগতমান অনুযায়ী এই চায়ের সর্বোচ্চ দাম কেজিপ্রতি ৫০০০ টাকা (৭৭ ডলার ২০ সেন্ট) পর্যন্ত ওঠে।

দার্জিলিং সফরের দ্বিতীয় দিনের ভোর। সস্তার হোটেল থেকে বেরিয়ে ম্যালে এসেছি। সস্তার এই জন্যই যে, শুনলে হাসি পাবে, আমি আছি হোটেল এভারেস্টের একটি ডিলাক্স রুমে। মাত্র ৫০০ টাকার বিনিময়ে। মরশুমে যেটির ভাড়া ১৮০০, ক্ষেত্রবিশেষে ২৪০০। মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য সমস্ত আকাশ আলোয় ভরে গেল। আমার সামনে সূর্যালোকিত আলোর থালায় নিবেদিত পূর্ণ কাঞ্চনজঙ্ঘা। কাঞ্চনজঙ্ঘাকে যারা ভালবাসতে জানে অর্থাৎ যারা প্রেমিক, তাদের সমস্ত প্রেম গিয়ে এখানে থমকে দাঁড়ায়। সূর্য তাই তার প্রথম কিরণরাশি স্পর্শ করে তার ললাটচুম্বনে। সহজ, সরল পাহাড়ি মানুষ এবং মেয়েরা এই সাতসকালেই সাজগোজ করে সুন্দর সুন্দর জামাকাপড় পরে ম্যালে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সৌন্দর্য যেন উপচে পড়ছে। মুখের হাসি সারল্য দিয়ে ঘেরা। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে ছেলেদের জন্য কারণবারি, তাস খেলা, ঘুরে বেড়ানো। প্রায় হাজার পাঁচেক দোকান সামলাচ্ছে মেয়েরাই।

পৌঁছালাম দার্জিলিং টি অ্যাসোসিয়েশন-এর (ডিটিএ) অফিসে। চলমান সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে 'এখন ডুয়ার্স'-এর পক্ষ থেকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দার্জিলিং চায়ের বাজার সম্পর্কিত ক্ষেত্রসমীক্ষায় এসেছি শুনে অত্যন্ত খুশি হলেন। অন্য সাংবাদিক বন্ধুদের সঙ্গেও কুশল বিনিময় হল। তবে নেপালি ভাষা না জানা থাকায় এবারে ভাষাগত প্রশ্নে একটু সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। এর আগে দার্জিলিং চায়ের বাজার পরিস্থিতিতে গুডরিকস গ্রুপের পদস্থ আধিকারিক এএন সিংহর কাছ থেকে শুনেছিলাম, উৎপাদন মরশুমের দ্বিতীয় পর্যায়ে মোট চায়ের যে ২০ শতাংশ সংগৃহীত হয় তা স্বাদে এবং গন্ধে অতুলনীয়। উচ্চমূল্যের কারণে চা রপ্তানি থেকে মোট বার্ষিক রাজস্বের ৪০ শতাংশ আসে। এবারের মরশুমে উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ায় পুরো শিল্পে বিপর্যয় নেমে এসেছে। ইন্টারন্যাশনাল টি কমিটির তথ্য অনুযায়ী, প্রতি বছর গড়ে ৮০ লাখ কেজি দার্জিলিং চা উৎপাদিত হয়, যার দুই-তৃতীয়াংশ ইউরোপের বাজারে রপ্তানি হয়। জার্মানির হ্যালসেন অ্যান্ড লিয়ন, ব্রিটেনের ইউনিলিভার, টাইফু এবং টেটলির মতো জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান ও ব্র্যান্ডগুলো এই চায়ের প্রধান ক্রেতা। ডিটিএ সেক্রেটারি কৌশিক বসু জানালেন, চলমান সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে উৎপাদনকারীদের সম্মিলিত ক্ষতির পরিমাণ ৪ কোটি ডলার অর্থাৎ ২৬০ কোটি টাকা প্রায়। আগামী দিনগুলোতে সংকট নিরসনের কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কেউ জানে না, কবে এই অচলাবস্থা থেকে মুক্তি মিলবে।

কিছুদিন আগেই শেষ হয়েছে চলতি মরশুমে চা সংগ্রহের দ্বিতীয় পর্যায়। এখন পণ্যটি বাজারে সরবরাহের পালা। কিন্তু

সেকেন্ড ফ্লাশ দার্জিলিং চা

বন্ধ সত্ত্বেও দার্জিলিং চা ক্রয় করার প্রত্যাশায় বিদেশীরা দার্জিলিংয়ে

বিপত্তিটা অন্য জায়গায়। পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে আন্দোলন করছে দার্জিলিঙের গোর্খা সম্প্রদায়ের মানুষ। নেপাল থেকে আসা গোর্খারা দীর্ঘদিন ধরেই স্থানীয় চা-বাগিচাগুলোতে শ্রমিক হিসাবে কাজ করছে। বহু ধরনের চা রয়েছে পৃথিবীতে, কিন্তু চায়ের জগতে আলাদা কৌলীন্য দার্জিলিং চায়ের। দার্জিলিং জেলায় হিমালয়ের পাদদেশে ৮৭টি বাগানে এই বিশেষ জাতের চা হয়। কোনও কোনও চা গাছের বয়স দেড়শো বছর। বছরে ৮০ লাখ কেজির মতো দার্জিলিং চা উৎপাদিত হয়, যার অধিকাংশই যায় ব্রিটেন এবং জাপানে। অল্প কিছু যায় ইউরোপের অন্যান্য কয়েকটি দেশে। বিশ্বের চায়ের বাজারে সবচেয়ে দামি এই দার্জিলিং চা। কোনও কোনও ব্র্যান্ডের দাম কেজিপ্রতি ৮৫০ ডলার। দার্জিলিং চা-বাগান মালিকদের সমিতির উপদেষ্টা সন্দীপ মুখার্জি জানান, এক লক্ষ চা শ্রমিক কাজ বন্ধ রেখেছে। ফলে উৎপাদন দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বছরে যেখানে গড়ে ৮০ লাখ কেজি চা উৎপাদিত হয়, ধর্মঘটের কারণে এ বছর তার মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ তৈরি হয়েছে। ফলে মালিকরা ভয় পাচ্ছে, সরবরাহ কমে গেলে এবং দাম আরও বাড়তে থাকলে দার্জিলিং চায়ের অনেক সমঝদার হয়ত অন্য কোনও চায়ের দিকে ঝুঁকবেন। দার্জিলিং চায়ের উৎপাদন মরশুম মার্চ থেকে অক্টোবর। জুন-জুলাই হচ্ছে মরশুমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। দার্জিলিং চায়ের পাতায় তৈরি হওয়া ভিন্নধর্মী সুগন্ধ গরমের এই সময়কালে তৈরি হয়। পুরো মরশুমের মধ্যে অর্ধেক চায়ের উৎপাদনই হয় এই দুই মাসে। ফলে ভরা মরশুমে এই ধরনের ধর্মঘট বিপর্যস্ত করে ফেলেছে চায়ের বাগানগুলোকে। পৃথক গোর্খাল্যান্ডের আন্দোলন এর আগে '৮০-র দশক থেকে চলেছিল। কিন্তু এর আগে এই ধরনের শ্রমিক ধর্মঘটগুলো হত চা মরশুমের বাইরে। কিন্তু এবার শুরু হয়েছে ভরা মরশুমেই। চায়ের ক্রেতারা ইতিমধ্যেই সংকটটা টের পাচ্ছেন। দোকানের তাকে দার্জিলিং চা দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাচ্ছে। নতুন সরবরাহ না হলে নভেম্বরের মধ্যে দার্জিলিং চায়ের মজুত শেষ হয়ে যাবে। ধর্মঘটের কারণে দু'মাস ধরে দার্জিলিঙের চা-বাগানগুলোতে লোক নেই। আগাছায় ভরে গিয়েছে বাগানগুলো।

দার্জিলিঙের বিখ্যাত চা-বাগানগুলোর মধ্যে অরেঞ্জ ভ্যালি টি এস্টেট রক গার্ডেন যাওয়ার পথে পড়ে। হ্যাপি ভ্যালি টি এস্টেট হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট যাওয়ার পথে। দার্জিলিং শহর থেকে ১০ কিমি দূরত্বে এবং ভূপৃষ্ঠের ৬০০০ ফুট উচ্চতায় অরেঞ্জ ভ্যালি টি এস্টেট। কাছেই গঙ্গামায়া পার্কের সংস্কারের কাজ চলছে বলে যাওয়া হয়ে উঠল না। রক গার্ডেন যাওয়ার পথেই মেঘ আর পাহাড়ের মিলনস্থলে চা-বাগানের রাজত্ব। এই সৌন্দর্য সত্যিই মনোমুগ্ধকর। উঁচু থেকে যতই নেমে আসছি, ততই মনে হচ্ছিল, চা-বাগান যেন ঘন হয়ে চেপে ধরছে। আঁকাবাঁকা রাস্তার দুইপাশ জুড়ে ঘন সবুজের গালিচা। রক গার্ডেন ঘুরে রওনা দিলাম তেনজিং রক দেখতে। পথেই হ্যাপি ভ্যালি চা-বাগানের অবস্থান। এখান থেকে চা-বাগানের চমৎকার ভিউপয়েন্ট পাওয়া যায় বলেই হয়ত এটি দার্জিলিঙের অন্যতম দর্শনীয় স্থান। সারাক্ষণই সূর্য আর মেঘের মধ্যে লুকোচুরি চলছে। মেঘের অবগুণ্ঠন সরিয়ে পাহাড়ের ঢালের ঘরবাড়িগুলো অতিকষ্টে দৃশ্যমান হয়েই আবার মিলিয়ে যায়। চা-বাগানে কেউ যেন পাতা না ছেঁড়ে, তার জন্য জরিমানা বিষয়ক বোর্ড আছে। রাস্তার পাশে পাহাড়ের যে ঢাল থেকে চা-বাগান শুরু হয়েছে, সেই ঢালেই এক সারিতে অনেকগুলো চায়ের দোকান, যেখানে ফ্রি-তে চা পান করাবার ব্যবস্থা আছে। তবে ফ্রি-তে চা পান করার বিনিময়ে চা-পাতা কিনতে হবে।

গভীরভাবে উদ্‌বিগ্ন গুডরিক গ্রুপের প্রাক্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর রুপাকরণ এস ডেভিড। দার্জিলিঙে গুডরিক গ্রুপের প্রায় ৩০টি চা-বাগান। জানালেন দার্জিলিঙের চা-শিল্পে ১৫০ কোটি টাকা বা তারও বেশি ক্ষতির সম্ভাবনার কথা। দার্জিলিং সেকেন্ড ফ্লাশ বছরের সেরা এবং সবচেয়ে দামি চা, যার বেশির ভাগই রপ্তানি হয় জাপান, ইউরোপ আর আমেরিকায়। জুন থেকে সপ্তাহে সপ্তাহে তুলতে তুলতে জুলাইয়ের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে তোলা হয়ে যায় এই চা। এই বছর সেই চায়ের প্লাকিং হয়নি। প্রায় সমস্ত চা নষ্ট। নতুন করে গাছের প্রুনিং না করলে আর চা পাওয়া যাবে না। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, ক্ষতি সামলাতে না পেরে এ বছর দার্জিলিঙের বেশ কিছু চা-বাগান বন্ধ হয়ে যেতে পারে। দার্জিলিঙের চা-বাগানকে জুলাইয়ের মধ্যে সারা বছরের খরচ তুলে ফেলতে হয়। কারণ বর্ষা ও শরতের দার্জিলিং থেকে যে চা পাওয়া যায়, তার বাজারদাম অনেকটাই কম। উৎপাদনের খরচও সবসময়ে ওঠে না। সেকেন্ড ফ্লাশ চা দার্জিলিঙের মোট উৎপাদনের ২০ শতাংশ হলেও মোট আয়ের ৪০-৫০ শতাংশ আসে এই মরশুম থেকেই। ফার্স্ট ফ্লাশ চা পাওয়া যায় মার্চ মাস থেকে মে মাসের মধ্যে। সময়মতো বৃষ্টি না পাওয়ায় এ বছরের ফার্স্ট ফ্লাশ কিছুটা মার খেয়েছে।

ম্যাকলয়েড রাসেল-এর বার্ষিক সভায় চা-শিল্পের অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে পাহাড়ের পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত দেখলাম আদিত্য খেতানকে। দার্জিলিঙে তাঁদের কোনও বাগান না থাকলেও ডুয়ার্সে তাঁর সংস্থার পাঁচটি বাগান আছে। তাঁর মতে, দীর্ঘদিন রপ্তানি বাজারে দার্জিলিং চা না মিললে অন্য দেশের চা সেই জায়গা নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে, যেটা খুবই উদ্‌বেগের। চা-শিল্প সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, পাহাড়ে এতদিন বন্ধের জেরে চা-শিল্পের যে ক্ষতি হয়েছে তা স্বাভাবিক হতে তিন বছর পর্যন্ত সময় লেগে যাবে। সে ক্ষেত্রে একবার জায়গা হারালে তা পুনরুদ্ধার করা আরও কঠিন। আদিত্য খেতান জানান, তাঁরা প্যাকেটজাত চা ব্যবসাতে নামার কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাবছেন। এভারেডি সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে নতুন সংস্থার মাধ্যমে এই ব্যবসা চালুর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ম্যাকলয়েড রাসেল-এর পরিচালন পর্ষদ।

ব্রিটিশ কর্মকর্তা আর্থার ক্যাম্পবেল ১৮৪১ সালে দার্জিলিঙে প্রথম চা আবাদ শুরু করেন। এরপর ১৮৫০-এর দশকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সেখানে চা আবাদ শুরু হয়। দার্জিলিং টি নামে ভারতীয় ব্র্যান্ড আন্তর্জাতিক সুরক্ষা পায়। উচ্চমানের প্রতি কিলোগ্রাম দার্জিলিং চা বিক্রি হয় ১৮০০ মার্কিন ডলার মূল্যে। টাটা এবং ইউনিলিভার

এখন ডুয়ার্স প্রকাশিত বই

পর্যটনের বই

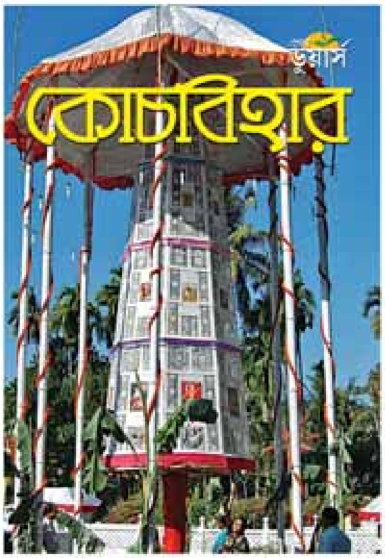

কোচবিহার। মূল্য ২০০ টাকা

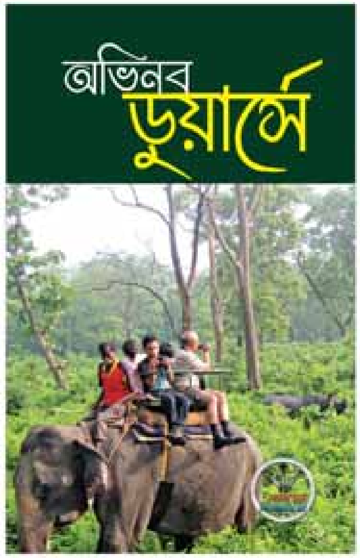

অভিনব ডুয়ার্সে। মূল্য ২০০ টাকা

চা-শিল্পের বই

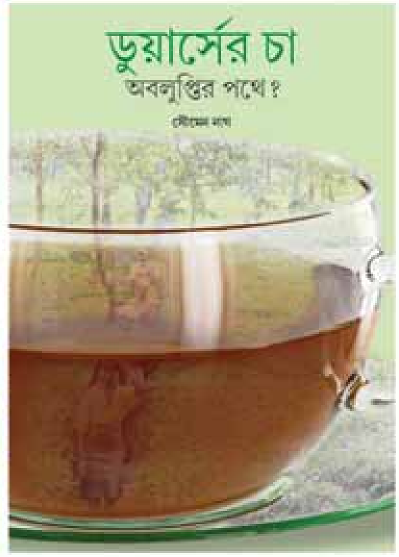

ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?
সৌমেন নাগ। মূল্য ১৫০ টাকা

সাহিত্যের বই

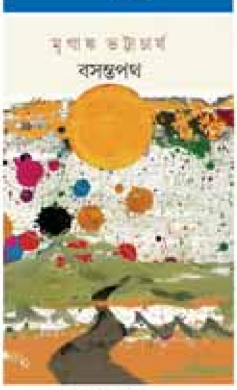

বসন্তপথ।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর উপন্যাস
মূল্য ১০০ টাকা

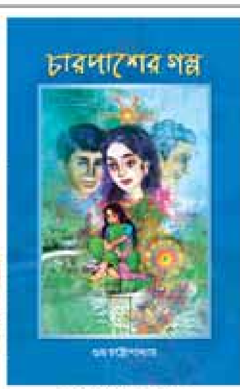

চারপাশের গল্প
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প সংকলন
মূল্য ১০০ টাকা

লাল ডায়েরি।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর গল্প সংকলন
মূল্য ১৫০ টাকা

ডুয়ার্সের হাজার কবিতা
মূল্য ৫০০ টাকা

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস
মূল্য ২৫০ টাকা

সবকটি বইয়ের ডুয়ার্সে প্রাপ্তিস্থান

আড্ডাঘর। মুক্তা ভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি

নিভৃত আলাপচারিতা ম্যালের নিরালা নির্জনে

বিশ্ব বাজারে বিভিন্ন ধরনের চা বিক্রি করে থাকে। আম্বিয়োর্ক টি এস্টেটের পরিচালক সঞ্জয় মিত্তল বলেন, অচলাবস্থার অবস্থান ঘটলে আগামী বছর ফসল তোলা যাবে। এ বছর কোনওমতেই ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব নয়। শিলিগুড়ির চা ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতিও একই মত পোষণ করে বলেন, আর কয়েক মাস ধরে ধর্মঘট চলতে থাকলে দু'-তিন বছরের মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ চা-বাগান পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, চায়ের দাম ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে। পাশাপাশি বেশ কিছু বাগান বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ভারত সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সংস্থা টি বোর্ড অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, জুন মাসে মাত্র ১ লাখ ৪০ হাজার কিলোগ্রাম চা উৎপাদিত হয়েছে। অথচ গত বছর একই মাসে উৎপাদিত হয়েছিল ১০ লাখ ৩০ হাজার কেজি চা। আমেরিকা, জাপান বা জার্মানির বিদেশি ক্রেতারা জানিয়ে দিয়েছেন, দার্জিলিং চায়ের জন্য আর অপেক্ষা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁরা নেপালের চায়ের মতো বিকল্প খুঁজতে শুরু করেছেন। দার্জিলিঙের চা-বাগানের ভয়ানক ক্ষতি করা এই আন্দোলনে লাভ হচ্ছে নেপালের চা-শিল্পের। দার্জিলিং চা একটা জিয়োগ্রাফিক্যাল ব্র্যান্ড হওয়া সত্ত্বেও দার্জিলিঙের চা নেই বলে ভারতের বাজারে তো বটেই, আন্তর্জাতিক বাজারেও নেপালের চা দেদার বিক্রি হচ্ছে দার্জিলিং চা বলে, দামও পাচ্ছে ভাল। দামি চায়ের বিদেশি ক্রেতারা একবার অন্য দিকে মুখ ঘোরালে তাঁদের আবার ফিরে পাওয়াও খুব একটা সহজসাধ্য নয়। সেই আশঙ্কাতেও সন্ত্রস্ত দার্জিলিং চা।

গুডরিকের প্রাক্তন শীর্ষকর্তা ক্রুপাকরণ ডেভিডের মতে, দার্জিলিং থেকে এ বছর লম্বা পাতার বিখ্যাত মাস্কাটেলগন্ধী চা যে শুধু উঠলই না তা নয়, ক্ষতি হল অনেক সুদূরপ্রসারী। চা শ্রমিকদের সঙ্গে বাগান কর্তৃপক্ষর দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি শেষ হয়েছে এ বছর মার্চে। আর্থিক ক্ষতির ধাক্কা সামলাতে বন্ধ হবে বেশ কিছু চা-বাগান। আঘাত লাগবে দার্জিলিঙের চা-শিল্পের শিরদাঁড়ায়। এই অবস্থায় চা শ্রমিকরাও তাঁদের

চা শ্রমিকদের সঙ্গে বাগান কর্তৃপক্ষর দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি শেষ হয়েছে এ বছর মার্চে। আর্থিক ক্ষতির ধাক্কা সামলাতে বন্ধ হবে বেশ কিছু চা-বাগান। আঘাত লাগবে দার্জিলিঙের চা-শিল্পের শিরদাঁড়ায়। এই অবস্থায় চা শ্রমিকরাও তাঁদের প্রাপ্য পাবেন কি না, যথেষ্ট সংশয় আছে।

প্রাপ্য পাবেন কি না, যথেষ্ট সংশয় আছে। বেশ সমস্যায় পড়েছেন চা-বাগান সংস্থার মালিকরা। দার্জিলিং চায়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে গুডরিক কর্তা উদ্‌বেগ প্রকাশ করেছেন। বৃহত্তম চা-বাগিচা সংস্থা ম্যাকলয়েড রাসেল-এর কর্তার চোখে-মুখেও চিন্তার ভাঁজ। সেকেন্ড ফ্লাশ চা বাজারে আসেনি বললেই চলে। গুডরিক গোষ্ঠীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর অরুণ সিংহ দার্জিলিং চা নিয়ে অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন। তাঁর মতে, রপ্তানি বাজারে এই চায়ের ঘাটতি কিছুটা মেটাতে ঝাঁপাতে পারে দার্জিলিঙের কাছাকাছি স্বাদের চা তৈরি করে এমন অন্য দেশের সংস্থাগুলি। পাহাড়ে এতদিন বন্ধের জেরে চা-শিল্পের যে ক্ষতি হয়েছে তা স্বাভাবিক হতে তিন বছর পর্যন্ত সময় লেগে যাবে। দার্জিলিং টি অ্যাসোসিয়েশন-এর চেয়ারম্যান বিনোদ মোহন জানান, বছরে কম করে ৪০০-৫০০ কোটি টাকার ব্যবসা চলে। এই পরিস্থিতির জেরে বিগত ফ্লাশে প্রায় ২০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।

চা বিশেষজ্ঞরা অনেকেই বলেন, দার্জিলিং চায়ে সেরার শিরোপার লড়াইটা মূলত গুডরিকের ক্যাসলটন আর কেজরিওয়ালদের জঙ্গপানা বাগানের মধ্যে। ১৮৩৫ সালে চার্লস গ্রাহামের হাতে গড়ে ওঠা ক্যাসলটন যদি ধ্রুপদী শিল্পী হয়, ৩৪ বছর পরে হেনরি মন্টোগোমারি লেনক্সের পত্তন করা জঙ্গপানা তাহলে আধুনিক বিস্ময়। স্বাদ আর গন্ধের নিরিখে ইদানীং জঙ্গপানা ক্যাসলটনকেও করা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে বলে অভিমত অভিজ্ঞ টি টেস্টারদের। তবে মকাইবাড়ি, হ্যাপি ভ্যালি বা থুরকেকেও তালিকার বাইরে রাখতে নারাজ অনেকেই। দার্জিলিঙের ১১৫ বছরের পুরানো জঙ্গপানা চা-বাগানে এই প্রথম দেখা গিয়েছে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির নোটিশ। চা-বাগিচা কর্তৃপক্ষর অভিযোগ, একজন কর্মী নিয়োগকে কেন্দ্র করে ইউনিয়নের নেতারা বেশ কিছুদিন ধরেই চাপ সৃষ্টি করছিল এবং আধিকারিকদের হুমকি, বাগানের কাজের ক্ষতিসাধন করা— এসব কাজ করছিল। কর্তৃপক্ষর ডাকা বৈঠকেও গরহাজির ছিলেন ইউনিয়নের পান্ডারা। তাই নিরাপত্তার স্বার্থে বাগান বন্ধ করে দেওয়া হয়।

মোর্চা সমর্থিত দার্জিলিং তরাই ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন লেবার ইউনিয়নই জঙ্গপানা চা-বাগানের একমাত্র শ্রমিক সংগঠন। বিভিন্ন বাগিচা মালিক সংগঠনের অভিযোগ, মোর্চা প্রভাবিত সংগঠনের সদস্য না হলে কাউকে কাজে নেওয়া যাবে না বলে ফতোয়া জারি করা হয়েছে। বাগানের মালিক শান্তনু কেজরিওয়াল জানান, ইউনিয়নের দাবি এবং আন্দোলন দুই-ই বেআইনি। দার্জিলিং টি অ্যাসোসিয়েশন-এর মুখ্য উপদেষ্টা সন্দীপ মুখোপাধ্যায়ের মতে, বাগান পরিচালনায় ইউনিয়নের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ কোনওভাবেই বরদাস্ত করা যাবে না। কার্যকারণ যা-ই হোক না কেন, যে বাগানের চায়ের কদর ব্রিটেন এবং ফ্রান্সে, সেখানে সামান্য কারণে জঙ্গিপনা করে বাগান বন্ধ করার প্রয়াসকে কোনও বিশেষণেই অভিহিত করা যায় না। লন্ডনের বিখ্যাত ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্সগুলোতে চায়ের তালিকায় জঙ্গপানা জায়গা করে নিয়েছে। দেশের বাজারে তার দেখা মেলে না বললেই চলে। সুতরাং জঙ্গপানায় তালা পড়ার অর্থ বিদেশি মুদ্রার আমদানিও কমে যাওয়া।

দীর্ঘ কয়েক বছর ধরেই ধুঁকছে পাহাড়ের চা-বাগিচাগুলো। গোদের উপর বিষফোড়ার মতো গত দেড় মাস ধরে পাহাড়ে বন্‌ধের জেরে বন্ধ রয়েছে কাজ। ফলে ব্যাপক ক্ষতির মুখে চা-বাগিচাগুলো, যার জেরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে পাইকারি বাজারে নিলাম ও খুচরো বিক্রি। অগাস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই পাইকারি বাজারে নিলাম বা সরাসরি বিক্রি হচ্ছে না দার্জিলিং চা। তাই ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে বিশ্ব বাজারে এবার টান পড়তে চলেছে বিশ্বখ্যাত দার্জিলিং চায়ের।

নতুন রঙের পোঁচ জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে!
‘কারিগরি মেধা কাজে লাগুক উত্তরের উন্নয়নে’

যুগের প্রয়োজনে বারবার বদলাতে হয় প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার ধরন, মান্ধাতার আমলের সিলেবাসের মধ্যে আটকে থাকলে চলে না, না হলে পিছিয়ে পড়তে পড়তে একসময় হারিয়ে যেতে হয়। যেমনটা বোধহয় ঘটতে চলেছিল এই ক্ষেত্রেও। স্থানীয় মানুষের চোখেই এককালের গ্ল্যামার খুইতে বসেছিল জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের গর্ব জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। কিন্তু তেমনটা হতে দিলে তো চলবে না! হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন কলেজের নয়া অধ্যক্ষ ও তাঁর টিম। সিলেবাসের বাইরে গিয়ে মেধা বিকাশের জন্য নানা সৃজনশীল কাজে যোগ দিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে নতুন প্রজন্মের ছাত্রদের। তাঁদের কারিগরি মেধা এবার পিছিয়ে পড়া উত্তরবঙ্গের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে কাজে লাগাবার বিবিধ পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে, যা নিঃসন্দেহে আগে কখনও হয়নি।

সম্প্রতি জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে সর্বাঙ্গীণভাবে আপডেট করে রাজ্য তথা দেশের অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোর সমকক্ষ করে তোলবার জন্য প্রয়াসী হয়েছেন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কর্তৃপক্ষ। তাই ২০১৬ সালের ২০ অক্টোবর জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেই অভীষ্ট লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে কলেজকে শীর্ষশিরোপা এনে দেবার মর্যাদার লড়াইয়ে তাঁর টিম নিয়ে নেমেছেন কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায়, সঙ্গে সহ-অধ্যক্ষ বিবেকানন্দ বিশ্বাস প্রমুখ। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন অন্যান্য অধ্যাপক, গবেষক, টেকনিশিয়ান ও কর্মীবৃন্দ, এবং সার্বিকভাবে উত্তরবঙ্গের শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রে কিছুটা হলেও দিশা দেখাতে শুরু করেছে জলপাইগুড়ি গভঃ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।

উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন প্রতিষ্ঠান জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। দীর্ঘ আলোচনায় অমিতাভবাবু জানালেন কলেজের এই দৃষ্টিভঙ্গি বদলের কথা, কলেজকে আরও উন্নততর করে তোলার লক্ষ্যে তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার কথা। ১৯৬১ সালে তৈরি হয় জলপাইগুড়ি গভঃ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। প্রথম দু'বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে, ১৯৬৩-১৯৯৯ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে, ২০০০ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত, কলেজটি ২০১২-২০১৩ সালে স্বশাসিত মর্যাদা লাভ করে। ২০১৪ সালে এমটেক এবং ২০১৬ সালে বিটেক ব্যাচ চালু হয়। মূলত অমিতাভবাবুর উদ্যোগেই কলেজের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয় ২০১৭ সালে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সৈকত মিত্র এবং পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব।

১৬৫ একর এলাকা জুড়ে এই

জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের সমাবর্তন উৎসবে প্রিন্সিপাল অমিতাভ রায় সহ অন্যরা

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পাশেই ডেঙ্গুয়াঝাড় টি এস্টেট। মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছে রেললাইন। মন ভাল করে দেবার মতো পরিবেশ। আর এই খোলামেলা পরিবেশেই কারিগরি শিক্ষার আপাত নীরস বিষয়গুলোকে সরস, প্রাণবন্তভাবে উপস্থাপিত করার তাগিদেই প্রযুক্তিগত প্রকৌশলকে বিজ্ঞানসম্মত, ছাত্রসাথি করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা বিষয়ের জন্য আলাদাভাবে অতিথি শিক্ষকদের প্রয়োজনভিত্তিক নিয়ে আসা হয় কলেজে। ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পঠনপাঠনের পাশাপাশি ওয়ার্কশপ, সেমিনার, কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। আইএসআই, যাদবপুর, শিবপুর, শিল্প কারখানার সঙ্গে যুক্ত পদস্থ আধিকারিক, প্রযুক্তিবিদ প্রমুখকে নিয়ে এসে শিল্প-বাণিজ্যের আধুনিক এবং বিজ্ঞানমুখী পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং পরিবর্তনের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচিতি ঘটাবার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি কলেজ ফ্যাকাল্টিও সমৃদ্ধ হয়। শিক্ষক, অধ্যাপক, গবেষকরাও বিভিন্ন বিষয়ে আধুনিক পাঠপ্রণালী সম্পর্কে অবহিত হন। এই অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ছাত্রছাত্রীদের উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে চান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কর্তৃপক্ষ।

একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে। খড়্গপুরের ছেলে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র শুভদীপ দত্তর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। সম্প্রতি অধ্যাপকদের নিয়ে পরিকল্পনা করে কলেজের অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী এবং জলপাইগুড়ি জেলা সদর হাসপাতালের চিকিৎসক শিবাজী রায়ের সহযোগিতায় ৪০-৫০ জন ছাত্রছাত্রীর একটা দল জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে অনতিদূরে রায়পুর চা-বাগানের ৩০০ পরিবারের উপর সার্বিক স্বাস্থ্যসমীক্ষা এবং মেডিক্যাল ক্যাম্প করতে যায়। কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায় জানালেন, 'ছাত্ররা শ্রমিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, পুষ্টি, আবাসন, নিবিড় স্বাস্থ্যবিধান, নিকাশি— সব বিষয়ে খুঁটিনাটি তথ্য সমীক্ষার মাধ্যমে জোগাড় করেছে। এই সমীক্ষার রিপোর্ট সরকারি স্তরে পাঠিয়ে পরিকল্পনা রূপায়ণে কাজ করার আবেদন জানানো হয়েছে।' কলেজের অধ্যাপক সৌপায়ন মিত্র জানান, 'পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন পরিষেবা যাতে চা-বাগান শ্রমিকরা পান, সেই লক্ষ্যে চা-বাগান শ্রমিকদের জন্য আমরা প্রকল্প প্রণয়ন করেছি, আমাদের টিম ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছে, ৫০ জন ছাত্রছাত্রীর দল সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তিন পাতার সমীক্ষাপত্র নিয়ে শ্রমিকদের ঘরে ঘরে গিয়ে সমীক্ষা করেছে। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার বাইরে এই ধরনের ফিল্ডওয়ার্কের প্রয়োজনীয়তা আছে।'

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর তৃতীয় বর্ষের ছাত্র রৌনক রায় জানায়, কলেজের পুঁথিগত পড়াশোনার বাইরে হাতেকলমে এই ধরনের সমীক্ষার কাজ করতে পেরে নতুন অভিজ্ঞতা হল তাদের। শুভদীপ দত্তর মতে, রায়পুর চা-বাগানের জমি, কৃষিব্যবস্থা, নিকাশি, প্রযুক্তিগত অব্যবস্থাকে কাটানোর জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেতেই পারে। এতে ব্রেন স্টর্মিং এবং সমস্যা সমাধানের পথ দু'টি দিকেরই লক্ষ্যপূরণ হবে। চা-বাগানের স্প্রেয়িং মেশিনের ব্যবস্থা যেমন শুভদীপের চিন্তাভাবনাকে আলোড়িত করেছে। শুভদীপের মতে, স্প্রেয়িং মেশিনে লিভারটাতে জোরে চাপ দিতে হয়। যান্ত্রিক প্রকৌশলে সামান্য পরিবর্তন করে পাম্পিং পদ্ধতিকে আরও সহজতর করা যেতে পারে। স্প্রে বট্‌লগুলোর ক্যাপাসিটি মাত্র ২০ লিটার। ফলে কিছুটা গিয়ে রিফিল করার জন্য ফিরে আসতে হয়, আবার যেতে হয়। এটা সময়সাপেক্ষ। এতে এনার্জি, শারীরিক শক্তি ক্ষয় হয়। শ্রমিক অল্পেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে সোলার প্রোজেক্ট ব্যবহার করে পাম্পিং স্টেশন থেকে সরাসরি পাইপের মাধ্যমে স্প্রে করার কথা ভাবা যেতে পারে।

পাশাপাশি লক্ষ্য সমাজের সর্বস্তরে যোগাযোগ তৈরি করা। গত ৭ অগাস্ট ২০১৭ কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন যে সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়, তাতে কলেজের '৬৭-৬৮ সালের ব্যাচের প্রায় আশিজনের মতো ছাত্র উপস্থিত হয়েছিলেন। যাঁরা পরবর্তীকালে সমাজে নানা সফল উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁদের সঙ্গে এখনকার প্রজন্মের ছাত্রদের ভাবনার আদান-প্রদান

হয়। এ ছাড়াও কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বিএসএফ ৬১ নং ব্যাটেলিয়নের পক্ষ থেকে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় অস্ত্রাদি এবং আধুনিক ও উন্নত প্রকৌশল নিয়ে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এর ফলে আধুনিক প্রযুক্তি, যুদ্ধের প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের ধারণা তৈরি হয়।

ছাত্রদের গবেষণার মনোভাব তৈরি করার লক্ষ্যে অধ্যাপকরা নিরন্তরভাবে ক্রিয়াশীল। কলেজের ওয়েবসাইট ছাত্ররাই বানিয়েছে। প্রত্যেকটি প্রকল্প, কর্মপরিকল্পনা, ক্ষেত্রসমীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ করা যাচ্ছে। এটা কলেজের সাফল্যের দিক বলে মনে করেন বিবেকানন্দ বিশ্বাস। ১৬০০ ছাত্রছাত্রীর, এককথায় অভিভাবক বলা চলে বিবেকানন্দবাবুকে। পড়াশোনা ছাড়া অন্য সবকিছু কাজের দায়িত্বে কর্মপ্রাণ এই মানুষটি নীরব কর্মী এবং ছাত্রমহলে অসম্ভব জনপ্রিয়। প্রথম বছরে ছাত্রছাত্রীরা যখন কলেজে ভরতি হয়, তখন ধারাবাহিক কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে কে কোন বিষয়ে পারদর্শী, সেটা জেনে বুঝে নেওয়া হয়। এরপর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে গ্রুপ তৈরির মাধ্যমে তাদেরকে সেই গ্রুপে নিযুক্ত করে তাদের অভ্যন্তরীণ সত্তাকে বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া হয়। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর উৎপল মণ্ডল খেলাধুলো এবং শরীরচর্চার দিকটা দেখাশোনা করেন। হস্টেল সুপার অরিন্দম সাহার তত্ত্বাবধানে যোগা, মেডিটেশন শেখানো হচ্ছে তাদের একাগ্রতা, ধীশক্তি বাড়ানোর লক্ষ্যে।

ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অন টেকনোলজি এনহ্যান্স লার্নিং আইআইটি খড়্গপুর-এর নোডাল সেন্টার হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে জলপাইগুড়ি গভঃ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এর ফলে প্রতিটি বিভাগের নির্দিষ্ট চ্যাপটারের অনলাইন স্টাডি মেটিরিয়াল, ভিডিয়ো, এনহ্যান্সড ভিডিয়ো, লেকচার ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রোজেকশনের মাধ্যমে তুলে ধরার ফলে পঠনপাঠন আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে। আইআইটি এবং আইআইএস অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স-এর যৌথ উদ্যোগে এই প্রকল্প চলছে। মূলত কলেজের প্রিন্সিপাল অমিতাভ রায়ের তৎপরতা এবং উদ্যোগেই এই প্রকল্প গৃহীত হয়। কারণ কলেজে শিক্ষক বা ফ্যাকাল্টির অভাব থাকলে পঠনপাঠন যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তার জন্য ইউজিসি-র সাম্প্রতিক গাইডলাইন অনুযায়ী ২০ শতাংশ স্টাডি মেটিরিয়াল অনলাইনের মাধ্যমে পড়াতেই হবে। এর সুফলও ফলতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। ছাত্ররা রিসার্চ পেপার সাবমিট করছে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। ফ্যাকাল্টি সহযোগিতা করছে। টাটা কনসালটেন্সি আয়োজিত সর্বভারতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিবমকুমার দুবে ১১তম স্থান পায়। স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস, ফোটোগ্রাফি, মিউজিক, ড্রামা, মাউন্টেনিয়ারিং, ট্রেকিং—প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ক্লাবের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের গান, বাজনা, নাটক, খেলাধুলো, ফোটোগ্রাফি, পর্বতারোহণ শিক্ষাদানের মাধ্যমে সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হয়। সুবিশাল ওয়ার্কশপ, জিমন্যাশিয়াম, গ্যালারিযুক্ত খেলার মাঠ, অসাধারণ প্রাকৃতিক বৈচিত্র ও সম্পদে ভরপুর ক্যাম্পাসে ছাত্র শিক্ষক মেলবন্ধনই কলেজের গর্বের জায়গা। স্মার্ট ক্লাসরুমের মাধ্যমেও ছাত্রদের মনোজগৎকে আলোড়িত করার সুযোগ রয়েছে কলেজে।

জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের দেড় মাসের ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামও কলেজের নতুন সংযোজন বলে জানালেন অমিতাভ রায়। যাদবপুর, শিবপুর, বিভিন্ন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে গ্রীষ্মাবকাশে ছাত্ররা ইন্টার্নশিপ কোর্স করার জন্য যায়। সেখানে হাতেকলমে প্রোজেক্টে কাজ করে বাস্তব সমস্যাগুলোকে সমাধানের লক্ষ্যে নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তি অধিকার করার মধ্যে দিয়ে তাদের স্বাধীন সত্তার বিকাশ হয়। তিনজন বিশিষ্ট এক্সপার্টকে নিয়ে একটা কমিটি গঠিত হয়। তারা প্রত্যেকে আলাদা আলাদাভাবে মূল্যায়ন করে, মতামত দেয়। এরপর প্রোজেক্ট গ্রহণ করা হয়। এইভাবেই আরামবাগের কুমারেশ দে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। ইতিমধ্যেই ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্টের বিষয়ে তার একটি পেপার প্রেজেন্টশন আন্তর্জাতিক জার্নালে স্থানলাভ করেছে।

কলেজের সার্বিক রূপ বদল নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী বর্তমান অধ্যক্ষ অমিতাভ রায়। কোচবিহারের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম পুটিমারি। সেখানকার পুটিমারি হাই স্কুলেই পড়াশোনা অমিতাভবাবুর। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুধীররঞ্জন সাহাই যে তাঁর জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছিলেন, পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে সেটা স্বীকার করতেও ভুললেন না। যাদবপুরের স্নাতক, বম্বে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে এমই, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি, অমিতাভ রায় প্রথম থেকেই চেয়েছিলেন শিক্ষকতাকেই ব্রত হিসাবে গ্রহণ করতে। বম্বের ফাদার কনসাও রডরিগস কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্রথম শিক্ষকতার কাজে যোগদান, তারপর বম্বে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে, পরবর্তীতে সিকিম মণিপাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে, তারপর এনআইটি শিলচর এবং অবশেষে অধ্যক্ষ হিসাবে জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ২০১৬ সালে যোগদান। প্রায় ৫০টির উপর আন্তর্জাতিক গবেষণাপত্র প্রকাশ, ইউকে-র ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব এনার্জি সেক্টরে বেস্ট পেপার প্রেজেন্টশন অ্যাওয়ার্ড ২০১২ সালে পেয়েছেন অমিতাভবাবু। ২০১৬-১৭ সালে ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বেস্ট পেপার প্রেজেন্টেশনের জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন। তাঁর লেখা বই 'ফাউন্ডেশন স্কিল ইন ইন্টিগ্রিটেড

কলেজের ছাত্রদের খেলাধুলা

প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট' বইটিতে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর একজন ছাত্র যে কোনও ইন্ডাস্ট্রিতে যোগদান করার আগে ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে ধারণা তৈরিতে সহায়ক হবে। তাই অকপটেই বললেন, 'আমি গ্রামের ছেলে। গ্রাম অবহেলিত। কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, ব্যবসা—কী সমাজনীতি, কী অর্থনীতি, শতেক প্রতিকূলতা। তাই ছোটবেলা থেকেই উত্তরবঙ্গের শিক্ষা-শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিকরণের লক্ষ্যে কাজ করার একটা স্বপ্ন ছিলই। অধীত শিক্ষাকে হাতেকলমে প্রয়োগ করে আমার নিজের জন্মভূমি, নিজের মাটি, নিজের স্বজনকে কিছু প্রতিদান দেওয়াটাও আমার নৈতিক কর্তব্য।'উত্তরবঙ্গে পড়াশোনার প্রাথমিক পাঠ শুরু অমিতাভবাবুর। তাই উত্তরবঙ্গের উন্নতিতে এই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে ঘিরে স্বপ্ন দেখা শুরু করেছেন অমিতাভবাবু।

গৌতম চক্রবর্তী

দেবপ্রসাদ রায়

ইন্দিরা গান্ধী হত্যার পর শিখ দাঙ্গা। রাজীব গান্ধী সেনা নামাতে দেরি করেননি। একমাত্র যে কংগ্রেসি এমপি সে সময়ে দাঙ্গার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তিনিই এই ধারাবাহিকের লেখক। দাঙ্গা নিয়ে তাঁর বক্তব্য প্রচলিত ধারণাকে জোর আঘাত করেছে এবার। তারপর লোকসভা ভোট, দায়িত্ব নিয়ে লেখক গেলেন কেরল। সঙ্গে স্প্যারো সাহেব। আবার, অমেঠি লোকসভা আসনে প্রচারের জন্য একরাতের মধ্যে বাহিনী নামিয়ে এক লক্ষ প্রচারপত্র ভরা হল এক লক্ষ খামে। তারপর লেখকের বয়স হল ছত্রিশ। যুব কংগ্রেসের পালা ফুরিয়ে গেল তাঁর। কিন্তু রাজীব গান্ধীর সঙ্গে প্রণব মুখার্জির কোনও দূরত্ব তৈরি হল কি?

।।৪১।।

পশ্চিমবাংলার মানুষ জানেন মেদিনীপুরে দলীয় কর্মসূচী চলাকালীন খবর আসে, ইন্দিরাজী নেই এবং কীভাবে দ্রুততার সাথে রাজীবজী কলাইকুণ্ডা থেকে কলকাতা— কলকাতা থেকে দিল্লি পৌঁছেছিলেন। প্রধানমন্ত্রিত্বের পদে তিনি ছিলেন 'ন্যাচারাল চয়েস'— তাই তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর শপথ নেওয়াতে জ্ঞানী জৈল সিং রাষ্ট্রপতি হিসাবে কোনও বিলম্ব করেননি। মায়ের মতো তাঁরও শুরুটা হল turbulence-এর ভেতর দিয়ে।

ইন্দিরাজী যখন নিহত হন, তখন বিক্ষিপ্তভাবে পাঞ্জাব বা অসমসহ উত্তর-পূর্ব ভারতে অস্থিরতা থাকলেও দেশ জুড়ে ইন্দিরা বিরোধী কোনও হাওয়া ছিল না। তাই তাঁর হত্যা মানুষ মেনে নিতে পারেনি। ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে ও দিল্লিতে ব্যাপকভাবে শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ গণরোষের শিকার হলেন। শিখ অধ্যুষিত জায়গাগুলি (ত্রিলোকপুরী, মঙ্গলপুরী, সুলতানপুরী প্রভৃতি) অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল। আজও 'শিখ দাঙ্গা' রাজনীতিতে একটি আলোচিত বিষয়। এবং এই প্রসঙ্গ এলেই, জগদীশ টাইটলার, সজ্জন কুমার, এইচ কে এল ভগতের নাম আসবেই। এ প্রসঙ্গে যেটা জানানো দরকার যে, আজ পর্যন্ত কোনও আদালত বা কোনও কমিশন এঁদের দোষী সাব্যস্ত করেনি। বরং টাইটলার আর সজ্জন কুমার— দু'জনেই তারপরও দিল্লির নিজের নিজের কেন্দ্র থেকে ভোটে জিতেছেন। কিন্তু তবুও প্রচার আজও জারি আছে, ওঁরাই নাকি দাঙ্গা বাধিয়েছিলেন। আমি তখন দিল্লিতে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এবং একমাত্র কংগ্রেস এমপি, যে রানিবাগে ছ'হাজার দাঙ্গাপীড়িত শরণার্থীকে দশ দিন অস্থায়ী শিবিরে লঙ্গর চালিয়ে দু'বেলা খাইয়েছি। কেউ কিন্তু বলেনি, এই নেতারা জড়িত ছিল। সবাই প্রায় একই কথা বলেছে। যারা এসেছিল, লুঠ, অগ্নিসংযোগ, গণহত্যায় লিপ্ত হয়েছে, তারা সব অচেনা। বর্গীর মতো এসে নিমেষে সব তছনছ করে বেড়িয়ে গিয়েছে।

আমার ধারণা, এর পিছনে কোনও চক্রান্ত ছিল। যা আজও উন্মোচিত হয়নি। রাজীবজী পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে সঙ্গে সঙ্গে সেনা নামিয়ে দিয়েছিলেন, এবং নিজে রাত জেগে পুরো দিল্লি চষে বেড়িয়ে দেখতেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে কি না। তার ক'দিন পরেই বোট ক্লাবে বিশাল সমাবেশ হল। কংগ্রেসের ডাকে। জানি না, কে রাজীবজীর ভাষণ তৈরি করে দিয়েছিলেন, কিন্তু 'বট গাছ পড়লে মাটি কেঁপে ওঠা'র উদারহণটা পরবর্তীকালে বিরোধীদের হাতে হাতিয়ার তুলে দিয়েছে। লোকসভা নির্বাচন এগিয়ে এল। আমি আর জেনারেল স্প্যারো কেরালার পর্যবেক্ষক নিযুক্ত হলাম। স্প্যারো সাহেব এয়ারফোর্সে ছিলেন। ওঁর নাম ছিল রাজিন্দর সিং স্প্যারো। যদিও শেষ বিশেষণটি তাঁর বিমান আক্রমণের পারদর্শিতা দেখে '৬৫-র ভারত-পাক যুদ্ধের পর তাঁর নামের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছিল।

কেরালায় ২০টি আসন। আমরা ১০টি করে আসন ভাগ করে নিয়েছিলাম। মূলত তিন খেপে তাদের প্রাপ্য অনুদান পৌঁছে দেবার কাজ। কেরালাকে ওয়ান ভিলেজ বলা হয়। তার সবুজের জন্য আর একটির পর আর একটি জেলার ভেতর বিভাজন রেখা না

টানতে পারার জন্য। সবাই সবার গায়ে লেগে রয়েছে। নির্বাচন ওদের কাছে একটা উৎসব। সুদৃশ্য তোরণ, আলোকমালা, পতাকা সাজানোয় শৈল্পিক ছোঁয়া, এবং একের অপরের প্রচারকে সহন ও গ্রহণ করার মানসিকতা— আমি অনেক রাজ্যে কাজ করেছি, কিন্তু কেরালা অতুলনীয়— জানি না আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ মাঝখানে অনেকদিন তো পেরিয়ে গেল!

তখন দলের আর্থিক সহযোগিতা খুব সীমিত ছিল। যতদূর মনে আছে, এক-একজনকে, সব মিলিয়ে ৫ লাখ টাকা করে তিন খেপে দেওয়া হয়েছিল। দেড়-দেড়-দুই। দু'বার ঘুরে আসবার পর শেষ দফায় যাওয়ার আগে স্প্যারো সাহেব বললেন, 'ডিপি, একটি রাজ্য দেখার এটাও তো একটা সুযোগ। দুই ট্রিপে তুমি অর্ধেক আর আমি অর্ধেক কেরালা দেখেছি, এবার আমরা অদলবদল করে নিই। তাহলে দু'জনেরই পুরো রাজ্যটা দেখা হয়ে যাবে।' আমিও সহজভাবে ব্যাপারটা মেনে নিলাম। কেরালায় পা রাখার পরই বোঝা গেল— উনি এই প্রস্তাবটা কেন দিয়েছিলেন। প্রথম থেকে শেষ অবধি যে দশজনকে এবার আমার টাকা দিতে হল, তারা প্রায় প্রত্যেকেই তা ফিরিয়ে দিতে চাইছে। 'হোয়াট, স্প্যারো সাহেব বলল, এবার ৫ লাখ পাব, তুমি দু'লাখ দিচ্ছ?' বা কেউ বলছে, 'উনি আমায় আলাদা করে ২ লাখ টাকা পাঠাবেন বলেছিলেন, সেটা কই?' আমি বোঝাতে পারি না, এগুলো সবার ওঁর প্রবোধবাক্য ছিল, আমি যে টাকা নিয়ে এসেছি— দিল্লিতে ফোন করে জেনে নিন, তার বেশি আর দেবে কি না। যা-ই হোক, কোনওক্রমে সবার সঙ্গে দেখা করে যখন কেআর নারায়ণ সাহেবের কাছে গিয়েছি, উনি প্রায় ভেঙে পড়লেন। 'ডিপি, আমি কোনও দিন ভোট লড়িনি, পালঘাটের রাস্তাঘাট অবধি ভাল চিনি না, লোক চেনা তো দূরের কথা। আমার সব টাকা ওরা নিয়ে গিয়েছে, তারপর শুনছি নিচে অনেক জায়গাতেই কোনও টাকা পৌঁছায়নি। আমি এখন যদি আর একটু বেশি টাকা না পাই তাহলে লড়তেই পারব না।' ওঁর অসহায়তা দেখে আমি দিল্লিতে জর্জকে ফোন করে রাজীবজীকে জানাতে বললাম। রাজীবজী জর্জ মারফৎ জানালেন, লোক ঠিক করলে ওঁর জন্য আরও এক লাখ টাকা পাঠিয়ে দেবেন, আমি হরিয়ানার সুখবীর কুণ্ডু, যে আমার দিল্লির বাড়িতেই বারো মাস থাকত, তাকে দিয়ে টাকা আনিয়ে নিয়েছিলাম। নারায়ণ সাহেব সে সহযোগিতার কথা কখনও ভোলেননি। উনি রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রথাগতভাবে অনুষ্ঠিত সান্ধ্য চায়ের আসরে আমি আমন্ত্রিত থেকেছি।

আমার প্রোগ্রামের জাতীয় সম্মেলন কেন হল না জানিয়েছি। রেলকে সওয়া দু'লক্ষ টাকা অ্যাডভান্স করা হয়ে গিয়েছিল। বেশ কিছুদিন পর সে টাকাটা ফেরত এল। শিখ দাঙ্গার সময় আমার একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল। চল্লিশ হাজার ছেলে আসবে, তাদের থাকা-খাওয়া, শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে রাখা, তার জন্য অনেক স্বেচ্ছাসেবক লাগবে ভেবে একটা এটিসি করা হয়েছিল। তারাই স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করবে। অর্থাৎ জাতীয় সম্মেলনের কোনও ত্রুটি ছিল না। তারা কতটা তৈরি হয়েছে, তারও একটা 'ট্রায়াল রান' হয়ে গিয়েছিল। আমেথির একটি সভাতে এক লক্ষ ইস্তাহার বিলি করা হবে। তাকে খামের ভেতর ভরে দিতে হবে একরাতের ভেতর। কারণ পরের দিন দুপুরেই বিলি হবে।

ইন্দিরাজীর অকালপ্রয়াণে প্রোগ্রাম বাতিল হল বটে, কিন্তু একটা নতুন দায়িত্ব চেপে বসল। এক, এরা ফিরতে পারছে না, যদিও শিবির শেষ হয়ে গিয়েছে। আর বিভিন্ন রাজ্যে যে শিখ ছেলেরা ট্রেনিং নিয়ে জেলায় জেলায় কাজ করছিল, পরিস্থিতি প্রতিকূল বুঝে তারাও কোনওক্রমে দিল্লি এসে ৫ রায়সিনা রোডের অফিসে আশ্রয় নিয়েছে।

এটিসি-র ছেলেদের নিয়ে এলাম, ২এ মোতিলাল নেহেরু মার্গে। ওখানে বসে সারারাত জেগে ছেলেরা কাজটা তুলে দিল।

ইন্দিরাজীর অকালপ্রয়াণে প্রোগ্রাম বাতিল হল বটে, কিন্তু একটা নতুন দায়িত্ব চেপে বসল। এক, এরা ফিরতে পারছে না, যদিও শিবির শেষ হয়ে গিয়েছে। আর বিভিন্ন রাজ্যে যে শিখ ছেলেরা ট্রেনিং নিয়ে জেলায় জেলায় কাজ করছিল, পরিস্থিতি প্রতিকূল বুঝে তারাও কোনওক্রমে দিল্লি এসে ৫ রায়সিনা রোডের অফিসে আশ্রয় নিয়েছে। এটিসি-র ছেলেরা এবং হরভজন, কৃপাল সিং, বলদেব, গুরবীর, বলবিন্দার-সহ একগাদা সর্দার এসে আশ্রয় নেওয়াতে পুরো অফিসটাই একটা শরণার্থী শিবিরের চেহারা নিয়েছিল। দশ দিন পর অবস্থা স্বাভাবিক হল। যদিও কাউকে বসিয়ে রাখিনি। রানিবাগের ক্যাম্পে সবাইকে নিয়ে হাজির করলাম। ছ'হাজার লোককে সামলাতে হবে। চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। প্রথমে কাউকেই ওরা ঢুকতে দিতে রাজী ছিল না। আমি নিজেকে বাঙালি এমপি পরিচয় দিয়ে এন্ট্রি নিয়েছিলাম। দু'-একদিনের ভেতর একটা সহযোগিতার বাতাবরণ তৈরি হয়ে গেল। দশ দিন ছিলাম। তৃতীয় দিন থেকে আমাদের আর কোনও কিছুই করতে হয়নি। সকাল হলেই সর্দারনিরা চলে আসত। কাছের গুরুদ্বার থেকে 'লোহ্' নিয়ে আসা হয়েছিল, একসাথে একশো রুটি বানানো যায়। ফটাফট আটা মেখে 'লোহ্'তে রুটি বানিয়ে একপাশে সবজি রান্না করে সকলকে খাইয়েদাইয়ে প্লেট-সহ রান্নার বাসনকোশন ধুয়ে রেখে চলে যেত। সে সময় বুঝেছিলাম, একেই ওরা 'করসেবা' বলে।

যে কথা বলছিলাম, এই অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছিল, অফিসটাতে একটা ট্রানজিট অ্যাকমোডেশন থাকা উচিত। ছেলেরা তো আসেই। সবাইকে বাড়িঘর ছাড়িয়েছি, একটা অস্থায়ী আস্তানা দেওয়ার দায়িত্ব আমার উপরই বর্তায়। আমি তাই রেল কর্তৃপক্ষের থেকে ফেরত পাওয়া সওয়া দু'লক্ষ টাকা দিয়ে ৫, রায়সিনাতে একটা ২০ শয্যার হস্টেল বানিয়ে নিলাম। তিন দিন থাকা-খাওয়া ফ্রি।

আমি চলে আসবার পরও কিছুদিন চালু ছিল। তারপর তো প্রোগ্রামটাই বন্ধ হয়ে গেল। ওখানে এখন এনএসইউআই-এর প্রধান দপ্তর। যারা ওঠে, বসে, তারাই জানে না, কে বানিয়েছিল, আর কেন বানিয়েছিল। এই সময়টাতে একটা মজার ব্যাপার হল। একদিন আমেরিকার এমব্যাসি থেকে সেকেন্ড সেক্রেটারি ফোন করে বললেন, তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি বললাম, 'খুব ভাল। আসুন, কালই আসুন।' পরের দিন এলেন। আমার ট্রেনিং প্রোগ্রাম নিয়ে অনেক প্রশ্ন। তারপর আসল কথায় এলেন। 'শুনেছি, তোমার এই প্রোগ্রাম রাশিয়ানরা বানিয়ে দিয়েছে?' আমি বললাম, 'ওরা বানায়নি। তবে তোমরা চাইলে আমি তোমাদের জন্য বানিয়ে দিতে পারি।' এর জন্য কি না জানি না, দু'দিন পর মিঃ তাপুরিয়া বলে একজন ফোন করলেন। উনি ইউএসআইএস থেকে আমাকে আমন্ত্রণ জানাতে চান। পরের দিন এলেন। জানা গেল, ওরা আমাকে এক মাসের জন্য ইউএস ভ্রমণে নিয়ে যেতে চায়। আমার ট্যুর প্রোগ্রামটা আমাকেই বানিয়ে দিতে হবে। যা দেখতে চাইবে, যেখানে থাকতে চাইবে, সবই ওরা ব্যবস্থা করে দেবে। খুবই

আকর্ষণীয় অফার। এমপি ছিলাম, তাই ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট ছিল। ডিপ্লোম্যাটিক ক্লিয়ারেন্সও নিতে হল।

সব ঠিক। বিদেশমন্ত্রক ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছে। টিকিট এসে গিয়েছে। এগজিকিউটিভ ক্লাসের। আমাকে ব্রিফিং দেওয়ার জন্য তাপুরিয়া সাহেব আইআইসি-তে লাঞ্চে ডেকেছেন। আমি ঠিক করলাম, আগে রাজীবজীকে জানিয়ে নিই, তারপর তাপুরিয়ার ব্রিফিং নিয়ে নেব। রাজীবজীর কাছে সময় নিয়ে গেলাম। আমন্ত্রণের কথাটা বলে ডিপ্লোম্যাটিক ক্লিয়ারেন্সের কথাটাও জানিয়ে বললাম, 'এবার খালি আপনার অনুমতির অপেক্ষা।' উনি বললেন, 'ডিপি, অভি উস্ মুল্ক মে মত্ যাও।' আমি বললাম, 'আপনি যেমন বলবেন।' পরের দিন তাপুরিয়ার লাঞ্চ। একটা বড় 'ফিশ অ্যান্ড চিপস্'-এর অর্ডার দিলেন আমার জন্য। বাঙালি তো! খাবার এল। উনি বললেন, 'মি. রায়, আপনি আইটেনারি ফাইনাল করে দিন। আর তো সময় নেই।' আমি বললাম, 'তাপুরিয়া সাহেব, আমি যাচ্ছি না।' উনি অবাক বিস্ময়ে বললেন, 'জানেন, আপনি কী হারাচ্ছেন?' বললাম, 'ওটা হয়ত জানি না। তবে গেলে কী হারাব, সেটা খুব ভাল করেই জানি।'

।।পর্ব- ৪২।।

রাজ্যসভার যখন সদস্য হলাম, তখন ৩৫ বছর বয়স। '৮৫-র ফেব্রুয়ারিতে ৩৬-এ পা দিয়ে দলকে জানিয়ে দিলাম, আমার যুব কংগ্রেস করবার বয়স পেরিয়ে গিয়েছে। একটু অপেক্ষা করতে বলা হল। কিন্তু আমি সারাজীবনটাই চেষ্টা করেছি, একটু ব্যতিক্রমী থাকতে। তাই মার্চে ইস্তফা নিজেই পাঠিয়ে দিলাম। দেরী কেন হচ্ছে, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না। ট্রেনিং প্রোগ্রামটা যুব কংগ্রেসের কর্মসূচী ছিল। তাই যুব কংগ্রেস থেকেই এবার দায়িত্ব নিতে হবে। তার অনুসন্ধান চলছিল। ইতিমধ্যে রাজীবজী বার দুয়েক বলেছিলেন, 'ডিপি, এবার মেয়েদের জন্য একটা শিবির ভাবো।' আর বোঝা বইব না বলে বললাম, 'কো-অর্ডিনেটর প্রোগ্রামে মনিটরিং ইউনিটে তিনজন মহিলা নিয়োজিত ছিল, তাদের একজন ইতিমধ্যেই আমার স্ত্রী। তারপরও শুধু মেয়েদের জন্য আমাকে শিবির করতে বলছেন?' রাজীবজীর 'সেন্স অফ হিউমার' ছিল। খুব হেসে বলেছিলেন, 'না, না, তাহলে আমাকে অন্য কাউকে দেখতে হয়। না হলে তোমার ভবিষ্যতের বোঝা আমাকেই বইতে হবে।'

শেষ পর্যন্ত সুরেশ পাচৌরিকে দায়িত্ব দেওয়া হল। ওকে মধ্যপ্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি আমিই নিযুক্ত করেছিলাম, তাই মনে হল, ছেলেরা আমার কাছে এলেও, ও

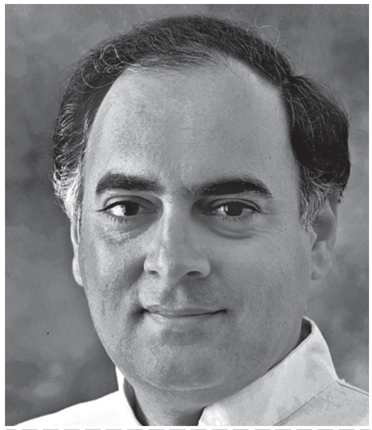

রাজীবজীর সঠিক মূল্যায়ন আজও হয়নি। তিনিই একমাত্র প্রধানমন্ত্রী, যিনি শান্তি প্রক্রিয়ায় পাঞ্জাব, মিজোরাম, অসম, ত্রিপুরা— সব রাজ্যকে ভারতীয় সংবিধানের পরিকাঠামো মেনে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যুক্ত হতে উগ্রবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলোকে রাজি করাতে পেরেছিলেন। অসমে আসু, মিজোরামে লালডেঙ্গা, পাঞ্জাবে লঙ্গোয়াল, ত্রিপুরায় বিজয় রাংখল— সবাইকে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করিয়ে নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় আনতে পেরেছিলেন।

অন্যভাবে নেবে না। ৩০ এপ্রিল '৮৫ সালে পাচৌরি এল। আমি ছাড়লাম। মাত্র এক ঘণ্টা 'পদহীন' ছিলাম। বিকেল ৫টা এআইসিসি থেকে মুপানরজী প্রেস রিলিজ করে জানালেন, আমি এআইসিসি-র সংযুক্ত সচিব নিয়োজিত হয়েছি।

একসাথে অনেকগুলো রাজ্যের নির্বাচন এসে গেল। পাঞ্জাব, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচল, রাজস্থান। রেকর্ড না দেখলে এতদিন পরে এর চেয়ে সঠিক তথ্য দেওয়া যাবে না। কিন্তু যা জানানোর তা হল, ফোতেদার সাহেবের ফোন এল। ১ আকবর রোডে ঢুকলাম। উনি বললেন, 'রাজীব, তোমার ছেলেদের ভেতর কারা নির্বাচন লড়তে পারে, তাদের তালিকা চেয়েছে।' আজ নিঃসংকোচে বলি, আমি এটা চাইনি। আমি ছেলেদের 'সেবার' রাজনীতিতে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলাম, ক্ষমতার রাজনীতি থেকে দূরে রেখে— তা বোঝানো গেল না। যা-ই হোক, আমি সিলেকটিভলি ৫০ জন ছেলের নাম দিয়ে এলাম। ফোতেদার সাহেব বললেন, রাজীব ১০০ জনের নাম চেয়েছে। আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, 'বিধায়ক হওয়ার মতো ১০০ জন যোগ্য ছেলে আমার প্রোগ্রামে নেই।' গোটা আলোচনাটা এপি শর্মা বসে শুনছিলেন। আমি বেরিয়ে আসতে আমার পেছন পেছন এসে হাত চেপে ধরে বললেন, 'ডিপি, মেরা বেটা কা নাম তেরা লিস্ট মে ডাল দে।' আমি বললাম, 'তা কী করে হয়? আমি এই মিথ্যাচার করতে পারব না।' তিনি গোমড়া মুখে চলে গেলেন। ৫০ জনের ভেতর ২২ জন টিকিট পেল। ১৮ জন জিতে এল। আমি অরুণ নেহেরুর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য নিয়ে ২২ জনের কেন্দ্রে গিয়ে প্রত্যেককে প্রতীকী সাহায্য ১০ হাজার টাকা করে দিয়ে এলাম।

রাজীবজীর সঠিক মূল্যায়ন আজও হয়নি। তিনিই একমাত্র প্রধানমন্ত্রী, যিনি শান্তি প্রক্রিয়ায় পাঞ্জাব, মিজোরাম, অসম, ত্রিপুরা— সব রাজ্যকে ভারতীয় সংবিধানের পরিকাঠামো মেনে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যুক্ত হতে উগ্রবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলোকে রাজি করাতে পেরেছিলেন। অসমে আসু, মিজোরামে লালডেঙ্গা, পাঞ্জাবে লঙ্গোয়াল, ত্রিপুরায় বিজয় রাংখল— সবাইকে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করিয়ে নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় আনতে পেরেছিলেন। তাতে অসমে হিতেশ্বর সইকীয়ার সরকারকে বলি দিতে পিছপা হননি। অসমের প্রচারে আমি গিয়েছিলাম। যেদিন সইকীয়ার আসন নাজিরাতে অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে জনসভা করছি, জলপাইগুড়ি থেকে খবর এল, 'মা' নেই। নিকটবর্তী শহর ডিব্রুগড়। সেখান থেকে সারারাত গাড়িতে চোখের জল ফেলতে ফেলতে সকালে গৌহাটি এসে, গাড়ি বদলে ১০ ডিসেম্বর বিকেলে মায়ের শেষকৃত্যে যোগ দিয়েছিলাম।

সেই সময়টা ভারত-রুশ মৈত্রীর সময়। ফলে রুশ প্রভাবিত ও পরিচালিত দেশীয় সংস্থাগুলি অত্যন্ত সজীব ও সক্রিয়। তার ভেতর যে সংস্থাটি সবচেয়ে কর্মব্যস্ত ছিল 'পিস অ্যান্ড সলিডারিটি কাউন্সিল' (PISCUS)। আন্তর্জাতিক সভাপতি ছিলেন রমেশ চন্দ্র। অসাধারণ বাগ্মী। আর ওঁর স্ত্রী পেরিন রমেশ চন্দ্র ছিলেন ইন্ডিয়ান চ্যাপ্টারের সভাপতি। আমার কিউবা সফর ও বক্তৃতা ওঁদের নজরে পড়েছিল। তাই '৮৫-তে সিডনিতে পিসকাসের প্যাসিফিক কান্ট্রিগুলির যে সম্মেলন, তাতে আমিও

আমন্ত্রিত হলাম। ছোট অনুষ্ঠান, বেসরকারি, তাই সবই উদ্যোক্তাদের করতে হচ্ছিল। এয়ারপোর্টে ওঁরাই দু'-তিনজন নিজেদের গাড়ি নিয়ে আমাদের নিতে এসেছিলেন।

যে ভদ্রলোক আমাদের নিয়ে রওয়ানা দিলেন হোটেলের উদ্দেশে, তিনি গাড়ি চালাতে চালাতে বললেন, 'নোবডি ওয়ান্টস্ টু কাম হিয়ার, বিকজ উই আর সাইফার।' দু'দিন সময় লেগেছিল। বুঝতে পারলাম উনি দূরত্ব বোঝাতে 'সো ফার' বলতে চেয়েছিলেন। দলে চিত্তদা বলে একজন বাঙালি ভদ্রলোক ছিলেন। কায়রোতে থাকতেন। তাঁর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। ওঁকে যখন ব্যাপারটা বললাম, উনি বললেন, 'আমি আজ কী শুনলাম জানো? আমায় একজন কর্মকর্তা জিজ্ঞেস করল, আর ইউ গোয়িং টু ডাই? প্রথমটায় আমার মটকা গরম হয়ে গিয়েছিল। তোদের দেশে এসে অসুখ নেই, বিসুখ নেই, মরতে যাব কেন? একটু আলাপ চালিয়ে বুঝতে পারলাম, ও জানতে চাইছে, আমি আজ যাব কি না।' এখানেই ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফিজিয়ান হরিশ চৌধুরীর সাথে দেখা হয়েছিল, যিনি পরে ফিজির প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। দেখে মনে হবে, ইন্ডিয়া থেকেই এসেছেন। চেহারায় এতটাই ভারতীয়ত্ব। আমি তাই হিন্দিতেই প্রশ্ন করেছিলাম, 'আপ কাঁহাসে?' উনি বললেন, 'রোহ্‌তক।' তারপর ভেঙে বললেন, 'আমি এখন ফিজির নাগরিক, আমরা তিন পুরুষ ধরে ফিজিতেই আছি।'

ইতিমধ্যে আমাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এবার মূল কংগ্রেসের ট্রেনিং করতে হবে। আমাকে তার রূপরেখা বানাতে বলা হল। এই বিষয়টা নিয়েও এতদিনে ট্রেনিং বনাম দল সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা তৈরি হয়ে গিয়েছে। যুব কংগ্রেসের ট্রেনিংয়ে যে ক্লাসগুলো হত, তার ভেতর একটা বিষয় ছিল 'সায়েন্টিফিক টেম্পার'। আমরা শুনেছি, সাহেবরা প্রথম হাটেবাজারে, মানুষকে বিনে পয়সায় চা খাইয়ে চায়ের বাজার তৈরি করেছিল। তার ফলশ্রুতিতে চা আজ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। তেমনই কোনও একটা বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তার একটা অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হয়। তাকেই সেই বিষয়টির পক্ষে 'টেম্পার' গড়ে তোলা বলে মনে করা হয়ে থাকে।

আমি ভাবলাম, এই সুযোগটাকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে, যাতে যুব কংগ্রেসের কর্মসূচীটার পক্ষে এই প্রস্তাবিত কর্মসূচী একটা অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে পারে। ওদের তৈরি করা হয়েছিল 'সোশ্যাল চেঞ্জ এজেন্ট' হিসেবে। এদের ভাবা হল 'পলিটিকাল চেঞ্জ এজেন্ট' হিসেবে প্রস্তুত করে তোলা।

আমার চিন্তাভাবনা নিয়ে রাজীবজীর কোনও সন্দেহ ছিল না। তাই ডিজাইনটা অ্যাপ্রুভ হয়ে গেল। ঠিক হল, মুম্বই শতাব্দী সমারোহের পর কাজটা শুরু হবে।

মায়ের কাজ শেষ হয়েছিল ২১ ডিসেম্বর। মুম্বই অধিবেশন ছিল ২৬ ডিসেম্বর। বরাবর একমুখ চুলদাড়িতে চেনা মানুষটাকে হঠাৎ করে মুণ্ডিতমস্তকে ও দাড়ি-গোঁফবিহীন দেখে অনেকে চিনতে সময় নিচ্ছিলেন। মুম্বইয়ের কোনও একটা ব্যস্ততম জায়গায় অধিবেশনের প্রথম দিন রাজীবজী ইন্দিরাজীর একটি প্রতিমূর্তির আবরণ উন্মোচন করতে গিয়েছিলেন। হাজার দুয়েক মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল চারিদিক ঘিরে। যদিও ওই ভিড়ের ভেতর আমি একটু কাছেই ছিলাম। রাজীবজী উন্মোচনের কাজ শেষ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ডিপি, অধিবেশন মে অন্দর জানেকে লিয়ে কাফি হাঙ্গামা হো রহা হ্যায়। জলদি যাকে সামাল্‌হো।'

> নির্বাচনটায় প্রণবদা খুব খেটেছিলেন। আমিও প্রচারে খুবই রুচি নিয়েছিলাম। তবুও যখন শেষরক্ষা হল না, তখন মনটা খুব ভেঙে পড়ল।

সামলাতে শেষ পর্যন্ত হয়নি। কারণ, ততক্ষণে পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে ফেলেছে। কিন্তু হাজারকয়েক মানুষের এই ভিড়ের ভেতর এই পরিবর্তিত চেহারাতেও আমাকে চিনতে ওঁর কোনও ভ্রম হয়নি!

শেষ দিনে প্রায় শেষের দিকে আমি মঞ্চের পেছন দিকে বসেছিলাম। মুপানরজী এসে বললেন, 'রাজীব তোমায় খুঁজছে।' আমি এগিয়ে গেলাম। উনি বললেন, 'তিন মিন্‌টো মে বাতা দো নয়া ট্রেনিং ক্যা হোনে যা রহা হ্যায়। ভাষণবাজী মত্ কর্ না।' কংগ্রেসের শতাব্দী অধিবেশন মঞ্চ থেকে বলবার সুযোগ বেশি লোক পায়নি। কিন্তু উনি আমাকে সেই গৌরবে গৌরবান্বিত হতে সাহায্য করেছিলেন। দিনের শেষে, বেঙ্গল ডেলিগেটরা ব্যাগ পায়নি বলে যখন চিৎকার-চেঁচামেচি করছে, আমি স্টোরে গিয়ে সবার ব্যাগ নিয়ে এসে যখন বিলি করছি, সুদীপ বলল, 'মিঠু, উই আর অল প্রাউড অব ইউ।'

এই বছরেই প্রণবদার সভাপতিত্বে কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে আমরা খুব ভাল ফল করেছিলাম। মাত্র তিনটি আসনের জন্য আমরা বোর্ড গড়তে পারিনি। আমি তিনজনের নাম দিয়েছিলাম, তাদের একজন টিকিট পেয়েছিল (অশোক সাহা), বাদ গেল টনি আর সন্টা। প্রচারে খুব সক্রিয় ছিলাম। আমার উত্থানে মানুদাও (সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়) খুশি ছিল না। কালীঘাটের একটা সভায় পৌঁছাতে দেরী হয়ে গেল। মানুদা তখনও বলেননি। আমি সাঙ্গোপাঙ্গসহ একটা মিটিং সেরে ওখানে সবে পৌঁছেছি। রথীন তালুকদার বক্তৃতা শেষ করতেই মানুদা বললেন, 'তুমি পাঁচ মিনিট বলে নাও। তারপর আমি বলব।' আমি বললাম, 'আপনার আগে পাঁচ মিনিট সত্তরের দশকের জলপাইগুড়িতে বলতাম। এখন আশির দশকে, আপনার পরেই বলব। কারণ, এখন পাঁচ মিনিট বলার জায়গায় আমি নেই।'

টালিগঞ্জের দিকে একটা ওয়ার্ডে সুরেন দাস বলে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোককে দাঁড় করানো হয়েছিল। কারণ ওখানে তখন রুনু বলে একজন প্রাক্তন মস্তান দলটাকে সামলাত। ওরই প্রার্থী ছিল সুরেন দাস। আমি মিটিং করতে গিয়েছি। দেখলাম, পাশেই বামেদের মিটিং হচ্ছে। বক্তা জ্যোতিবাবু, একটু দাঁড়ালাম শুনব বলে। ওঁর জনসভা আমি কখনও শুনিনি। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পরবর্তীতে ওঁর সঙ্গে একবার জয়গাঁর উন্নয়ন নিয়ে দেখা করতে গিয়েছিলাম। বাবরি ভাঙার পর অনেকবার দেখা হয়েছে, সে গল্পে পরে আসব। জ্যোতিবাবুকে শুনছিলাম। বলছেন, 'প্রচার হচ্ছে, কলকাতাকে বাঁচাতে স্বাধীনতা সংগ্রামী সুরেন দাসকে জয়ী করুন। আরে বাবা, সুরেন দাসটা না খেতে পেয়ে মরতে বসেছে। সরাসরি বললেই হয়, সুরেন দাসকে বাঁচাতে "হাত" চিহ্নে ভোট দিন। লোকটা খেয়ে-পরে বাঁচবে। কলকাতাকে আবার জড়ানো কেন?'

নির্বাচনটায় প্রণবদা খুব খেটেছিলেন। আমিও প্রচারে খুবই রুচি নিয়েছিলাম। নানা কারণে মিটিংও অনেক পাচ্ছিলাম। তবুও যখন শেষরক্ষা হল না, তখন মনটা খুব ভেঙে পড়ল। দিল্লিতে তখন আমি যথেষ্ট প্রভাবশালী। গুরুত্বও অনেক। কিন্তু একটা দুর্বল জায়গায় মানুষ আঘাত করলে কোনও উত্তর দিতে পারতাম না। মনে কষ্ট পেতাম। 'ডিপিজী, আপ ইতনা মেথডিকালি দল কো মজবুতি দিলানে মে লগে হুয়ে হো। লেকিন বঙ্গাল মে আপকা হালত্ ইতনা বুড়া কিঁউ?' বোঝাতে পারতাম না, চুরির কাছে হারছি, সন্ত্রাসের কাছে হারছি। মনে হয়েছিল, কর্পোরেশন থেকে জয়ের যাত্রা শুরু হবে। সেটাও থমকে গেল।

দিল্লি এসে রাজীবজীকে বললাম, 'প্রণবদা তো প্রায় জয়ের ঝুলি ভরতে চলেছিলেন। একটুর জন্য রয়ে গেল।' উনি বললেন, 'যঁহা জিৎ নেহি হুয়া, উহা ইন বাঁতো কা কোয়ি মতলব নেহি বনতা।' বুঝলাম, দু'জনের ভেতর কোথাও বোঝাপড়ার তারটা ছিঁড়ে গিয়েছে!

(ক্রমশ)

বিচ্ছিন্ন উত্তর ও নিরবচ্ছিন্ন ভোগান্তি
এই অবহেলার উত্তর কারও জানা আছে?

উত্তরপক্ষ

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

গত ১১ অগাস্ট জলপাইগুড়ি থেকে সন্ধ্যায় বৃষ্টি মাথায় নিয়ে কলকাতার পথে ট্রেনে চেপেছিলাম। তার আগে থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিল। শহরের পান্ডাপাড়া, নিউটাউনপাড়া, আনন্দপাড়ায় জল জমেছিল। যথানিয়মে শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্রগুলোতে জল জমার খবর ও ছবিসহ বড়সড়ো রিপোর্ট ছাপা হয়। শিলিগুড়িতে মেয়রের কাছে বিরোধী পক্ষের নেতারা গতানুগতিকতার ধারা বজায় রেখে— বৃষ্টির জমা জল নিষ্কাশনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানায়। এটা প্রায় রুটিন প্রক্রিয়া। কোচবিহার শহরটা এত দ্রুত কলেবরে বৃদ্ধি পেয়েছে যে, তাকে কোনও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার পরিমণ্ডলে ঢোকানোই যাচ্ছে না। আলিপুরদুয়ার শহরের বেশ কিছু ওয়ার্ডে জল জমার সমস্যা আছে। তবে উত্তরবঙ্গের শহরগুলোর জল জমার সমস্যা চিরকালীন। দুর্দশা সত্ত্বেও কিছু মানুষ জলে ডোবা শহরের সাময়িক রূপকে ওয়াটার স্পোর্টসের মতো উপভোগ করেন।

যা-ই হোক, ১১ অগাস্ট দার্জিলিং মেল ঠিক সময়ে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ ফোন এল স্ত্রীর মোবাইলে— জোর বৃষ্টি হচ্ছে জলপাইগুড়িতে, আমাদের বাড়ির সামনে হাঁটু-জল, আর দু'ইঞ্চি জল বাড়লে নিচের তলার ঘরে জল ঢুকবে। অনেক রাত অবধি ফোনাফোনি চলল, কিন্তু ঘরে জল ঢুকল না। ভাগ্যিস ট্রেনটা লেট করেছিল তাই সকাল সাতটা পর্যন্ত চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা গেল। ইদানীং নাকি ট্রেনে একদম ভিড় নেই— টিকিট পরীক্ষক দু'বার একই কথা বললেন। তবে যেহেতু চার দিন ছুটি থাকছে তাই ১১ তারিখ ট্রেন কানায় কানায় পূর্ণ ছিল।

সে দিন অর্থাৎ ১২ তারিখ কলকাতায় বাড়ি পৌঁছাতে প্রায় সকাল ৮টা হয়ে গেল। আমি তৈরি হয়ে বিধাননগর স্টেশনের কাছে ইকমার্ড নামে সমবায় দপ্তরের মিটিং হলে পৌঁছালাম। তখন কলকাতায় বৃষ্টি নেমেছে। আর কলকাতার বাড়িতে শুনলাম, গোটা উত্তরবঙ্গে গভীর নিম্নচাপের দরুন একটানা বৃষ্টিপাত চলেছে। উত্তরবঙ্গে স্থানীয় বৃষ্টির জন্য বিপদের সৃষ্টি হয় না, কিন্তু পাহাড়ে একটানা বর্ষণ হলে তিস্তা, মহানন্দা, তোর্সা, জলঢাকা, রায়ডাক প্রভৃতি নদী সঙ্গে সঙ্গে শাখানদী ও উপনদীগুলোতে বন্যা দেখা যায়। বন্যায় জলের সঙ্গে প্রচুর বালি মিশ্রিত পলি কৃষিজমিকে ধ্বংস করে দেয়। আসলে ১২ তারিখে ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের নিয়ে রাজ্য পর্যায়ের মিটিং ছিল। আমরা উত্তরবঙ্গ থেকে ১০-১২ জনের একটা টিম ওই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করি। পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, আড্ডা-আলোচনায় দিনটি ভালই কেটেছিল। ইকমার্ডে একটা তিন শয্যার কক্ষে সম্মেলনের পর আমি, অশোক, শ্রীহরি, জয়ন্ত, বিকাশ, শংকর, অমরদীপ এবং গৌতম অনেকক্ষণ আড্ডা মারি। শুভ, তাপস বাড়ি চলে যায়। ওই দিন রাত ১১.১৫টার পদাতিক এক্সপ্রেসে অশোক, শ্রীহরি, বিকাশ, অমরদীপ, গৌতম ও দানেশ উত্তরবঙ্গের পথে যাত্রা করে। দানেশ বাদে সবাই কোচবিহারে নামার কথা ছিল। গভীর রাতে বন্যাজনিত কারণে অচেনা পরিকাঠামোবিহীন বীরভূম জেলার চাতরা স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ে।

রেলের লোকজন সর্বত্রই খুব কম। যা কিছু মানুষজন আছে, তারাও বেপাত্তা। যাত্রীদের ক্ষোভ বাড়ছে। দার্জিলিং মেল, পদাতিক, কাঞ্চনকন্যা, উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস— ইত্যাদি আরও বহু ট্রেন রাস্তায় আটকে পড়েছে। অবশেষে জানা গেল, রেল লাইনের উপর দিয়ে জল বইছে, ট্রেন চালানো সম্ভব নয়। এসি বন্ধ, ট্রেনে জল নেই। প্রত্যেকের নিজস্ব খাওয়ার জলের স্টক শেষ। ছোট্ট স্টেশনের ছোট ছোট দোকানের বিস্কুট, কেকের যতটুকু মজুত ছিল তা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। এমন এক ভয়ানক কঠিন পরিস্থিতিতে ১৩ অগাস্ট সকালের সূর্য উঠল। তখনও ঝিরঝির বৃষ্টি পড়েই চলেছে। সবাই খবর পেয়েছে, ট্রেনে উত্তরবঙ্গ পৌঁছানো একেবারেই অসম্ভব। খবর পাওয়া গেল, স্টেশনের বাইরে অটো পাওয়া যাবে, যাতে চেপে মিনিট কুড়ি-পঁচিশের মধ্যে নলহাটি পৌঁছাতে পারলে ওখান থেকে সরাসরি উত্তরবঙ্গের বাস পাওয়া যেতে পারে। ভিড়ে ঠাসা

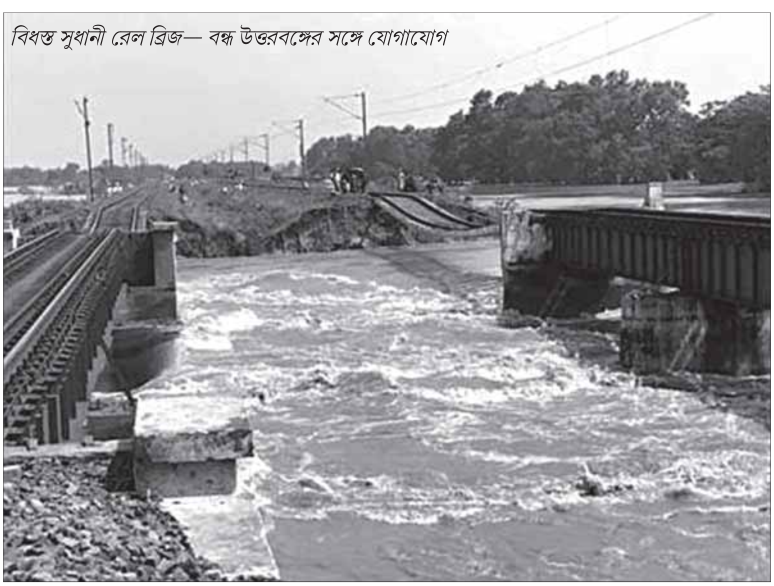

বিধ্বস্ত সুধানী রেল ব্রিজ— বন্ধ উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ

রায়গঞ্জগামী বাস সকাল ৮টা ৩০-এ পাওয়া গিয়েছিল। সেই বাস ১৩ ঘণ্টায় রায়গঞ্জ পৌঁছাল। এবং পথেই বোঝা যাচ্ছিল বন্যার প্রকোপ। রায়গঞ্জ শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন। নলহাটি থেকে অশোক ও বিকাশ দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। অশোকের কাছে শুধুমাত্র কাগজের পরিমাণ যা ছিল, তার ওজন ২৫-৩০ কেজি। ওই ওজন নিয়ে নড়াচড়া করাই সমস্যা। যা-ই হোক, রায়গঞ্জের শিলিগুড়ি মোড়ে জল-বৃষ্টিতে একটা দোকানে দাঁড়িয়ে শ্রীহরি, অমরদীপ এবং গৌতম। ইতিমধ্যে প্রতিটি মুহূর্তের খবর ছড়িয়ে পড়ছিল হোয়াট্‌স্‌অ্যাপে। আমাদের রিটায়ারিজ অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা অনাদি মাহাতো এবং রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক চম্পক মুখার্জি মূল সংগঠনের নেতৃত্বের সঙ্গে রায়গঞ্জে যোগাযোগ করেন। রাত প্রায় ১১.৩০টায় ব্যাঙ্ককর্মী কনক সেন ওদের উদ্ধার করেন এবং রাতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

১৪ অগাস্ট সকালে তিনজনে হাজির বাস স্ট্যান্ডে। কিছু প্রাইভেট বাস চলছে, কিন্তু যে কোনও মুহূর্তে তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বাসের টিকিটও নাকি চোরাপথে বিক্রি হচ্ছিল, বেশি দামে। শ্রীহরি তার প্রতিবাদ করেছে— গলা ফাটিয়ে। অবশেষে বাসযাত্রা শুরু হল। কুলিক নদীর ব্রিজ বাস খুব সাবধানে পার হল। বাসের সামনে তখন দু'জন লোক জলে ডোবা পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। সুধানি সেতুর আগে বাস থেকে সবাইকে নামিয়ে দেওয়া হল। সেতুর অবস্থা রীতিমতো সঙিন। প্রথমে বাস ধীরে ধীরে পার করানো হয়, তারপর পদব্রজে যাত্রীরা। পথে নানা ঝামেলা সহ্য করে ডালখোলার আগেই বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার

কষ্টকর বাসযাত্রা

কারণে যাত্রা বন্ধ হল। বাস আবার ফিরে এল রায়গঞ্জে। এবার ব্যাঙ্ককর্মী উত্তম দাসের বাড়িতে আশ্রয়— ফাঁকা বাড়ি। খাওয়ার ব্যবস্থাও উত্তম।

ওদিকে অশোক চৌধুরী ও বিকাশ ফৌজদার দু'জনে ১৩ তারিখ রাত ৯.৩০টায় মালদায় পৌঁছে বিকাশের দিদির বাড়িতে ঢুকে পড়ে। বাড়ি ফেরার চিন্তা ছাড়া মালদায় ওদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা 'বিন্দাস'।

> মনে প্রশ্ন জাগে, স্বাধীনতার ৭০ বছর পর উন্নত প্রযুক্তির যুগে কেন এমন রেলপথ তৈরি করা যাবে না, যা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে না? উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের মানুষ কেন বাধ্য হয়ে ভাববে, তারা অবহেলিত, উপেক্ষিত?

শহরে বন্যার যান টোটোগাড়ি

১৫ অগাস্ট স্বাধীনতা দিবস। রায়গঞ্জ শহর জলে থইথই। পথে শ্রীহরিরা যতগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেখেছে, প্রতিটিতেই পূর্ণ মর্যাদায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। শ্রীহরি দলবল নিয়ে আবার টিকিটের লাইনে। ভিড় বাসে দমবন্ধ করা অবস্থা। পরিস্থিতি আরও খারাপ— বাসের গতি অত্যন্ত কম। গাড়ি এবার ডালখোলা অতিক্রম করল। ভিতরে চাপা উত্তেজনা— তাহলে এবার শিলিগুড়ি পৌঁছানো যাবে। রাত প্রায় ৯টায় ক্লান্ত-বিধ্বস্ত তিনটি প্রাণী শিলিগুড়িতে বাস থেকে নামল।

পরদিন ১৬ অগাস্ট সকালে ইন্টারসিটিতে অমরদীপ ও গৌতম আলিপুরদুয়ারের পথে চলল। শ্রীহরি বাসে কোচবিহারে পৌঁছাল সকাল ৯.৩০-এ। গভীর সংগ্রাম করে দানেশ ১৩ তারিখে শিলিগুড়ি পৌঁছেছিল। এদিকে অশোক ও বিকাশ দু'জনে মালদা থেকে ১৬ তারিখে যাত্রা করে যখন রায়গঞ্জ পৌঁছাল, তখন সারা শহরে বন্যার জল দাঁড়িয়ে আছে। বন্যার্ত মানুষরা ত্রাণের দাবিতে বিক্ষোভ জানাচ্ছিল। পুরো রাস্তা বানের জলে ভেসে গিয়েছে। ওই ভিড় বাস কিষানগঞ্জ পৌঁছালে অশোক বাস থেকে মালপত্র নিয়ে নেমে পড়ে, অটোয় চেপে স্টেশনে পৌঁছায়। বিকাশ বাস থেকে নামেনি। অশোক বন্যার জলবিহীন কিষানগঞ্জ স্টেশনে এসে শুনেছিল, আর দশ মিনিটের মধ্যে একটা ট্রেন এনজেপি, নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার হয়ে গুয়াহাটি যাবে। ভাগ্যবান অশোক ফাঁকা ট্রেনে পূর্ণ আরাম ও বিশ্রামে কোচবিহার যাত্রা করল। অশোক ফোনে বাসযাত্রী বিকাশকে জানায়, রাত ৯টার মধ্যে এনজেপি স্টেশনে পৌঁছালে বিকাশও ট্রেনটি ধরতে পারবে। যা-ই হোক, বিকাশ ওই ট্রেন ধরেছিল এবং রাত দেড়টায় কোচবিহারের বাড়িতে ওরা পৌঁছায়।

আমি ১৮ অগাস্ট শিয়ালদা স্টেশনে কোচবিহার যাত্রী একটি পরিবারের সাক্ষাৎ পাই। তাদের দলে একজন বয়স্কা মহিলার

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only

Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {18.9cm (W) X 27.07 cm (H)}, Non Bleed {15.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {15.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {7.5 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {4.8cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 15.5 cm (W) X 5.2 cm (H), 1/4 Page 7.5 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {4.8 cm (W) X 11.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2017 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

জল থৈ থৈ মালদা মেডিক্যাল কলেজ

গোটা বুক ও পেট জুড়ে চওড়া বেল্ট আটকানো। উনি কোনওমতেই বাসে যেতে পারবেন না। ওঁদের ট্রেনেই যেতে হবে। ১৮ তারিখ রাতে কলকাতায় বাড়ি বসে টিভি সংবাদে জানলাম, পরদিনও উত্তরবঙ্গগামী সব ট্রেন বাতিল। আর বিমানের টিকিটের ফাটকা চলছে। বাগডোগরা থেকে দমদমের টিকিটের মূল্য ২৫০০০ টাকা ছুঁয়েছে। মানুষ বিপাকে পড়লে বিমান পরিষেবার নামে টিকিটের গলাকাটা দাম নেওয়া একান্ত অনুচিত। গণক্ষোভ লক্ষ করে রাজ্য সরকার বিভিন্ন বিমান সংস্থাকে টিকিটের ফাটকা নিয়ন্ত্রণ করতে বলেছে— অন্যথায় সরকার আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারে। নানা সরকারি বিবৃতি থেকে এটা পরিষ্কার যে, নিরবচ্ছিন্ন ট্রেন যাত্রা উত্তরবঙ্গসহ সমগ্র উত্তর ভারতে চালু করতে কমপক্ষে এক মাস সময় লাগবে। বিজ্ঞান ও টেকনোলজি এখানে বিনা বাক্যে পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে। কী বিপুল পরিমাণ কৃষিজমির আবাদ নষ্ট হয়েছে, তার আর্থিক অভিঘাত বার করা সম্ভব নয়। উত্তরবঙ্গে আগে কাঁচালংকার খুচরো মূল্য ছিল ৪০-৫০ টাকা/কেজি, এখন নাকি তা ২০০-২৫০ টাকা/কেজি। সমস্তরকম সবজির দাম আকাশ-ছোঁয়া। সামনেই দুর্গাপুজো। দেবীর নাকি এবার নৌকায় আগমন। লেখাটি তৈরির সময় আমি কলকাতায় আটকে। আমার বাড়ি ফেরার বিমানের টিকিট কাটা হয়েছে ২১-০৮-২০১৭ তারিখের।

বেশ কিছু দিন আগে অবসরপ্রাপ্ত সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার উৎপল ভদ্রর সঙ্গে তাঁর বাড়িতে পরপর কয়েকদিন আড্ডা মেরেছিলাম। সেচ ও জলপথ দপ্তরের কাজে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে ছিলেন উনি। উত্তরবঙ্গের নদী-চরিত্র তাঁর নখদর্পণে। উনি বলেছিলেন, যখন বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়, তার জেরে বাংলাদেশ এবং হিমালয়ের পাদদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাপক বৃষ্টি হয়। নেপাল ও ভুটানের অঢেল জল, সঙ্গে বিহারের বন্যার জল নেমে আসে উত্তরবঙ্গের নদীগুলোতে। এদিকে বাংলাদেশের প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতে ব্রহ্মপুত্র, মহানন্দা প্রভৃতি নদীও ফুলেফেঁপে ওঠে। সেই জল উলটো চাপে উত্তরবঙ্গের নদীগুলোতে ঢুকে পড়ে। এবার যখন একেবারে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি বন্ধ হল, তখন জলে ভাসল রায়গঞ্জ, মালদা এবং বালুরঘাটের বিস্তীর্ণ এলাকা। এর থেকে মুক্তির পথ প্রযুক্তিবিদদের ভাবতে হবে।

লেখাটি যখন তৈরি করছিলাম, তখন কলকাতায় আটকে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা সহ্য করে উত্তরবঙ্গ থেকে মানুষজন কলকাতায় ফিরছিলেন। ত্রাণের দাবিতে মাঝে মাঝে ৩৪ নং জাতীয় সড়কে নাগরিক বিক্ষোভ চলছিল। জলে ভেসে গিয়েছে কৃষিক্ষেত্র, অস্পষ্ট রাজপথ দিয়ে সন্তর্পণে প্রাণ হাতে নিয়ে যাত্রা।

কাঁচা আনাজপত্র নিয়ে শত শত ট্রাক মুর্শিদাবাদে আটকে। অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে খাদ্যবস্তুর আকাল দেখা দেবে— এটাই স্বাভাবিক। মনে প্রশ্ন জাগে, স্বাধীনতার ৭০ বছর পর উন্নত প্রযুক্তির যুগে কেন এমন রেলপথ তৈরি করা যাবে না, যা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে না? উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের মানুষ কেন বাধ্য হয়ে ভাববে, তারা অবহেলিত, উপেক্ষিত? কলকাতায় একটি সেমিনারে বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ ও রাজনীতিক মণিশংকর আইয়ার উপস্থিত ছিলেন— সেই গুণীজনদের সভায় উত্তরবঙ্গের অভিমানের কথা বলতে চেষ্টা করেছি।

'ম্যানমেড' বন্যা

আলিপুরদুয়ারে ?

১৯৯৩-এর বন্যার সঙ্গে ২০১৭-র বন্যার তফাত একটাই। '৯৩-এ শহরে জল ঢুকেছিল নদীর বাঁধ ভেঙে, কিন্তু আজ শহরের প্রান্তের নদীর বাঁধ যথেষ্ট পোক্ত। শুধুমাত্র বৃষ্টির জলে জলমগ্ন হয়ে রইল মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের পর্যটন শহর।

প্রায় দেড় দশক থেকে একটি শব্দ শুনে আসছিলাম— 'ম্যানমেড বন্যা', যা কোনও দিন বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি। ভাবতাম, হয়ত নেহাতই বাক্যবাণ। কিন্তু এবার হাড়ে হাড়ে টের পেলাম, শব্দবন্ধটি বাক্যবাণ নয়, কথাটি রূঢ় বাস্তব। ১৯৯৩ সালের পর ২০১৭। চব্বিশ বছর পর আলিপুরদুয়ার দেখল আর এক ভয়াবহ বন্যা। শহরের মূল রাস্তাগুলো জলের তলায়। হাসপাতাল থেকে বিদ্যুৎ, সমস্ত পরিষেবা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যেন এক আদিম জনপদ। '৯৩-এর বন্যার সঙ্গে '১৭-র বন্যার তফাত একটাই। ১৯৯৩-এ শহরে জল ঢুকেছিল নদীর বাঁধ ভেঙে, কিন্তু আজ শহরের প্রান্তের নদীর বাঁধ যথেষ্ট পোক্ত। শুধুমাত্র বৃষ্টির জলে জলমগ্ন হয়ে রইল দিদির স্বপ্নের পর্যটন শহর। জলে নিমজ্জিত বসতি, হবে না-ই বা কেন? জলাশয়গুলো দখল করেই যে বসতিগুলো গড়ে উঠেছে। এবারের আলিপুরদুয়ারের বন্যাটি পুরোটাই যে 'ম্যানমেড'। একটু চোখ মেলে নিরপেক্ষ চশমা পরলেই তা সহজেই অনুমেয় হয়। তার জন্য বড় সেচ বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই।

বহু বছর আগে কালজানি নদী শহরের প্রাণকেন্দ্র চিরে ভাঙাপুল দিয়ে প্রবাহিত হত। পরবর্তীতে নদীর গতিপথ ঘুরে গেলেও ভাঙাপুল তথা আজকের ১৩ নং ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল জলাশয়। কিন্তু স্থানীয় মানুষের অভিমত, গত কয়েক বছর ধরে ধীরে ধীরে জনা কয়েক জমি মালিকের দখলের শিকার হয়ে আজ ভাঙাপুল সংকুচিত হতে হতে স্রেফ একটি শীর্ণ নালায় পরিণত হয়েছে। ফলত, জল যাবার জায়গা না পেয়ে ডোবাচ্ছে শান্তিনগর, পূর্ব শান্তিনগর, দেবীনগর, ৬ নং ওয়ার্ড, আনন্দনগর, দ্বীপচর

> বলতে দ্বিধা নেই, আলিপুরদুয়ারের মানুষ দ্বিমত হবেন না, নতুন এই জেলার সরকারি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট দপ্তর সত্যিই ঠুঁটো জগন্নাথ হিসাবে নিজেদেরকে প্রমাণ করেছে।

প্রমুখ এলাকা। প্রত্যেক বছর এই রুটিন ভোগান্তির কারণ হল ১০-১২ জন মাফিয়ার জমি মস্তানি। অন্তত সেরকমই ধারণা এখানকার সাধারণ মানুষের, শহরের ১২ ও ১৩ নং ওয়ার্ডের বিশাল জলাশয়গুলো দখল করে তাদের গোডাউন বা বড় বড় দালান তৈরি হয়েছে বা হয়ে চলেছে।

এবার বন্যার ভোগান্তির শেষে শহর জুড়ে লাখ টাকার প্রশ্ন একটাই যে, এই ১০-১২ জন জমি মাফিয়ার জন্য হাজার হাজার মানুষ প্রতি বছর কেন জলের তলায় তাদের সর্বস্ব হারাবে? কেন তারা এই ভোগান্তির শিকার হবে? উত্তর সবার জানা থাকলেও সমাধানের পথ কারও হাতে নেই। কারণ এই মাফিয়াদের হাতে প্রচুর টাকা। তাই যুগে যুগে ক্ষমতাবান রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় এদের ক্ষমতা অপরিবর্তিত। আর হাজার হাজার মানুষের প্রতি বছরের ভোগান্তিও অপরিবর্তিত থেকে যায়। এই সাধারণ মানুষের ভোগান্তি নিয়ে যদি রাজনীতি হয়, তবে জনমতে তার প্রভাব পড়বে, বলাই বাহুল্য তা শুধু সময়ের অপেক্ষা।

সম্প্রতি ভূমিসংস্কার দপ্তরের উদ্যোগে অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি)-এর তৎপরতায় শহর জুড়ে জলাশয়গুলো চিহ্নিত করে, বোর্ড লাগানো হলেও জলাশয় বেদখল বা পুনরুদ্ধারের কোনও সদর্থক ভূমিকা দেখা যায়নি, কেবলমাত্র রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে।

শুধু বন্যা নয়, শহরে বড় কোনও অগ্নিকাণ্ড ঘটলেও দমকলবাহিনীকে হিমশিম খেতে হয়েছে জলের জন্য, ফলস্বরূপ ছাই হয়ে গিয়েছে অনেক বাড়ি তথা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। এত বিপদে পড়েও এদের বিরুদ্ধে মুখ খোলার জো নেই কারও।

এ তো গেল শহরের বন্যা। শহরতলির অবস্থা আরও ভয়াবহ। চাপাতলির কাছে নদীর বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় বীরপাড়া, চাপাতলি তথা পররপারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছিল জলের তলায়। ৯টি বাড়ি জলের তলায় পুরো ভেসে গিয়েছে। হাজারেরও বেশি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত। এ ছাড়া বন্যার ভয়াবহতা টের পেয়েছে খাগড়া, বঞ্চুকামারি, চ্যাংপাড়া, নোনাই, পালপাড়াসহ বিস্তীর্ণ এলাকা। গত ১২ অগস্ট প্রায় সমস্ত রাতটাই কাটে উদ্ধারের আর্তির ফোনে। প্রশাসনকে জানিয়েছি, সে এক অন্য গল্প। বলতে দ্বিধা নেই, আলিপুরদুয়ারের মানুষ দ্বিমত হবেন না, নতুন এই জেলার সরকারি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট দপ্তর সত্যিই ঠুঁটো জগন্নাথ হিসাবে নিজেদেরকে প্রমাণ করেছে। ছিল না পর্যাপ্ত বোট বা নৌকো বা পর্যাপ্ত উদ্ধারকারী দল। সে দিন রাতের দিকে জল বেড়েছিল। আরও তিন ফুট জল বাড়লে কী অবস্থা হতে পারত তা বুঝতে পেরেছি সেই জল ঠেলে, রাতভর এলাকায় এলাকায় ঘুরে মানুষের অভিজ্ঞতা শুনে। সে দিন বৃষ্টি না থামলে বা জলস্তর না নামলে শুধুমাত্র উদ্ধারকার্যের ব্যর্থতায় শয়ে শয়ে প্রাণহানি হলেই জেলার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের কঙ্কালসার চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠত চোখের সামনে।

বন্যা-পরবর্তী ত্রাণকার্য চালাতে গিয়ে দেখা গিয়েছে সর্বস্ব হারিয়ে মানুষের মধ্যে হাহাকার। পুরানো জামাকাপড় নেওয়ার জন্যও মানুষের অসহায় ঝাঁপাঝাঁপি। বন্যা-পরবর্তী পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবীদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব ছিল রোগ তথা মহামারি প্রতিরোধ করা। তাই এলাকায় এলাকায় ঘুরে আমাদের সংগঠন 'মানবিক মুখ' প্রতিটি টিউবওয়েল পরিষ্কার করে দেয়, কারণ সমস্ত পানীয় জলের কল বন্যার জলের শিকার হওয়ায় সহজেই পানীয় জলের মাধ্যমে মহামারি ছড়ানোর আশঙ্কা ছিল। বিতরণ করা হয় জল পরিষ্কার করার 'হ্যালোজেন ট্যাবলেট'। এভাবে স্বেচ্ছাসেবী দল এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মহামারির হাত থেকে রক্ষা করা গিয়েছে শহরতলির গ্রামগুলোকে।

তবে বন্যার পরে প্রশাসনিক যাবতীয় গাফিলতি ঢেকে গিয়েছে বেসরকারি তৎপরতায়। এবার যে তৎপরতা দেখাল আলিপুরদুয়ারের যুবসমাজ, তা উল্লেখ না করলে অবিচার করা হবে। বিভিন্ন

রাজনৈতিক দলের যুব ছাত্র শাখা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন থেকে শুরু করে ফেসবুকের মাধ্যমে যুবসমাজের ত্রাণকাজে ঝাঁপিয়ে পড়া সত্যিই প্রশংসনীয়। দুর্গতরা সত্যিই কিছুটা স্বস্তি, কিছুটা অক্সিজেন পেয়েছিল যুবসমাজের এই কর্মতৎপরতায়। বেসরকারি উদ্যোগে বন্যা দুর্গত প্রতিটি এলাকায় স্বাস্থ্য শিবির বন্যার পর বড়সড়ো বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল আলিপুরদুয়ারকে। এরই মধ্যে অন্য এক ছবিও বারবার ধরা পড়েছে। সরকারি ত্রাণ না পেয়ে ক্ষোভে বিভিন্ন এলাকায় মানুষের পথ অবরোধ।

২০১৭-র বন্যা বোধহয় চোখে আঙুল দিয়ে এক অশনিসংকেত দিয়ে গেল। এবারের উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা না নিলে হয়ত আগামী দিনে জেলার ভাগ্যে এক অন্যরকম বিপদ অপেক্ষা করছে, যা বলাই যায় অবশ্যম্ভাবী। জনমতের রোষানল আগাম অনুভব করুক নেতারা, তাহলে হয়ত শহর তথা দলেরই মঙ্গল। জলাশয় দখল মুক্ত হোক। বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর সেজে উঠুক। ভবিষ্যতে যেন এ বিষয়ে আর কাউকে এই জেলা থেকে কলম ধরতে না হয়।

রাতুল বিশ্বাস

অরণ্য মিত্র

ক্যাভেন্ডিসের অবাক হওয়ার পালা। ব্যানার্জি তাঁকে এ কী জানিয়ে গেল? দাসবাবুরা অবশ্য নিরাপত্তার খাতিরে মনামি আর মায়াঙ্ককে পাঠিয়ে দিয়েছেন গোপন জায়গায়। সেখানে হিংস্র বাঘিনিতে পরিণত হল মনামি। আর যার খোঁজকে কেন্দ্র করে এই কাহিনিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন কনক দত্ত, সেই শ্যামলের পরিণতি কি জানা গেল অবশেষে? উত্তেজনা আর যৌনতা মেশানো অন্ধকার জগতের মেগাসিরিয়ালের উপসমাপ্তিতে এবার অন্য শিহরন, অন্য উত্তাপ।

১১৫

শেষ রাতে ফোনটা বাজতে শুরু করায় ক্যাভেন্ডিসের ঘুমটা ভেঙে গেল। এই সময়ে ফোন মানে বিশেষ কিছু ব্যাপার আছে। ক্যাভেন্ডিস তাই বিরক্ত হলেন না। হাত বাড়িয়ে মোবাইল তুলে নিয়ে নম্বরটা দেখলেন। সেটা বেশ অবাক করল তাঁকে। তিনি অনুমান করলেন, কোনও স্যাটেলাইট ফোন থেকে কেউ তাঁকে ডাকছে। যে নাম্বারে ফোনটা এসেছে, সেটা দিল্লি হাই-এর উপরমহল ছাড়া আর কেউ জানে না। কিন্তু তাঁদের দল এখনও স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার শুরু করেনি। বুদ্ধ ব্যানার্জি মারফত চিনের একটা গ্রুপের সঙ্গে ডিল শুরু হয়েছিল স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার নিয়ে।

প্রসঙ্গটা মাথায় আসতেই ক্যাভেন্ডিস যেন ফোনকারীকে ধরতে পারলেন। কলটা ধরে বেশ প্রসন্ন গলায় বললেন, 'বলুন দাদা।'

'কী করে বুঝলে, এটা আমি?' ওদিকের গলায় কৌতূহলের সুর শোনা গেল।

'আমার এই নাম্বার আপনি জানতেন। দু'নম্বর হল যে, আমাদের পয়সায় স্যাটেলাইট ফোন আর নেটওয়ার্ক কিনে আপনি তা বেমালুম হজম করে নিয়েছেন।'

'সব আর পারলাম কোথায়? পল অধিকারীকে তিনটে সেট দিতে হল।' ওপাশ কিঞ্চিৎ আপশোসের গলায় জানালেন, 'আর দিল্লির পয়সায় কিনেছি ঠিকই, কিন্তু ভেবে দেখো ক্যাভেন্ডিস— দিল্লিকে কি আমি কম দিয়েছি?'

'মানছি। পয়সার কথা ছাড়ুন। আপনাকে ডিস্টার্ব করবে না বলে দিল্লি ডিসিশন নিয়েছে।'

'তা-ই?'

'কেন, আপনি জানেন না?' ক্যাভেন্ডিস বিস্মিত হয়।

'তবে আজ রাতে আমার লোকের উপর হামলা করল কে?'

'হামলা?' ক্যাভেন্ডিসের মুখ দেখে বোঝা গেল, সে একটু বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে, 'আপনার লোক কোথায় কী করছে তা ট্র্যাক করা আমি বন্ধ করে দিয়েছি। কোন হামলার কথা বলছেন?'

'একটা রিসর্টে আমার লোকের উপর হামলা হয়েছে ক্যাভেন্ডিস!' ওপারের গলা এবার কঠিন শোনাল, 'উইদ হেভি অটোমেটিক আর্মস। আমার ইনফর্মেশন পেতে একটু লেট হয়েছিল। এর ফলে সেখানে সিকিয়োরিটির জন্য যে স্নাইপারকে পাঠিয়েছিলাম, সে লেট হয়ে যায়। সে যখন গিয়েছে, তখন অপারেশন শেষ। দাস আর সুরেশ কুমার বরাতজোরে বেঁচে ফিরলেও শুক্লা আর রাজা মরেছে। সঙ্গে দুটো সিকিয়োরিটি।'

'কী বলছেন দাদা?'

'আমার পাঠানো স্নাইপার হামলাকারীদের দেখেছে। শুট করলেও ফাইনালি পারেনি। হামলাকারীদের সে ঠিক চিনতেও পারেনি। বাট দে হ্যাভ হাই এন্ড অটোমেটিক গান। লাইক এম সিক্সটিন ফোর এ।'

'ডুয়ার্সে এ জিনিস!' ক্যাভেন্ডিস হতভম্ব হয়ে যান, 'এ তো নেপালি মাওবাদী ছাড়া কারও হাতে নেই দাদা!'

'তারা কার মাধ্যমে এ জিনিস ডুয়ার্সে ভাড়া খাটায়?'

‘মাই গড! নবীন রাই!’ ক্যাভেন্ডিস বিছানার উপর উঠে বসেন, ‘কিন্তু নবীন এসব একমাত্র আমাদের ব্যবহার করতে দেয়।’

‘তার মানে তোমরাই এই হামলার জন্য দায়ী।’ হিমশীতল গলায় টেলিফোনের ওপার থেকে বললেন বুদ্ধ ব্যানার্জি, ‘কিন্তু তোমার কাছে কোনও ইনফর্মেশন নেই।’

‘রাইট দাদা!’

‘আমার স্নাইপার একজন লোককে দেখেছে, যার কাঁচাপাকা চুল। খুব সাধারণ পোশাক। সে-ই হামলাকারীদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। চিনতে পারছ তাকে?’

‘গেস করছি দাদা।’

‘আমি একজনকে ভেবেছি।’

‘বোসবাবু!’ আচমকা উত্তেজনায় সোজা হয়ে গেলেন ক্যাভেন্ডিস, ‘ইয়েস দাদা! দিল্লি থেকে আমাকে জানিয়েছিল যে, বোসবাবু ডুয়ার্সে আসবেন। কিন্তু তিনি তো কোনও ইনফর্মেশন দেননি!’

‘তবেই বোঝো, কী ধরনের সিস্টেমে কাজ করছ তুমি। বাট আই ডিডন্ট মাইন্ড। গুড নাইট ক্যাভেন্ডিস।’

বুদ্ধ ব্যানার্জি লাইন ছেড়ে দিলেন। ক্যাভেন্ডিস থম মেরে খাটের উপর বসে থাকল। বোসবাবু এসে নবীন রাইয়ের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে ব্যানার্জির লোকের উপর হামলা করে চলে গিয়েছে— অথচ সেটা তিনি জানতেন না। এটা কোনও সিস্টেম হল? নাকি তাঁকে জানানো হয়নি?

১১৬

চারপাশে ঘন জঙ্গলের মধ্যে এমন একটা জায়গায় ছোট একটা বাংলো থাকতে পারে, সেটা না দেখলে বিশ্বাস হত না মনামির। ছোট বাংলোটাকে বাইরে থেকে দেখে পরিত্যক্ত আর ভূতুড়ে বলে মনে হলেও ভিতরটা রীতিমতো তকতকে। পল অধিকারীর লোকেরা বাংলোটা দেখাশোনা করে। বন দপ্তরের খাতায় অবশ্য লেখা আছে যে বাংলোটি ধ্বংসপ্রাপ্ত, জঙ্গলাকীর্ণ এবং বুনো জন্তুর ডেরা। ভিতরের খবরটা কেবল পল অধিকারীর লোকেরাই জানে। কেএলও আন্দোলনের দিনে বাংলোটা তারা ব্যবহার করত কিডন্যাপ করা লোককে আটকে রাখার স্থান হিসেবে।

সে দিনের ঘটনার পর থেকে সে আর মায়াঙ্ক আলাদা দুটো জায়গায় কয়েক দিন কাটিয়েছে। অতঃপর দু’জনকেই আজ দুপুরে আনা হয়েছে এখানে। আজ খুব সকালে মাদারিহাট থেকে মায়াঙ্ককে নিয়ে একজন চলে এসেছিল হ্যামিলটনগঞ্জে মনামির আস্তানায়। জনৈক পাদরির অতিথি হয়ে দিন কাটাচ্ছিল মনামি। পাদরি ভদ্রলোক পল অধিকারীর দলের বহুদিনের সমর্থক— জানবার পর মনামি বেশ অবাক হয়েছিল। ডুয়ার্সে অন্ধকার জগতের জাল কতটা জটিল, সেটা আরও একবার টের পেয়েছিল সে।

সকাল থেকেই আকাশে ঘন মেঘ। পাদরি ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিল যে, দুপুরের মধ্যেই ভারী বৃষ্টি নামবে। হ্যামিলটনগঞ্জ থেকে কালচিনি চা-বাগান পেরিয়ে চুয়াপাড়ার দিকে কিছুটা রাস্তা গাড়িতে যাওয়ার পর একটা অপেক্ষারত মোটরবাইক তাদের দু’জনকে তুলে নিয়েছিল। তারপর নদী পেরিয়ে ঢুকেছিল জঙ্গলের ভিতরে। শেষ রাস্তাটুকু অবশ্য হাঁটতেই হয়েছিল তাদের। পাদরির কথা ফলেছিল অক্ষরে অক্ষরে। তারা এই বাংলোতে আসার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শুরু হয়েছিল বৃষ্টি। তুমুল বেগে সে বৃষ্টি এখনও ঝরেই যাচ্ছে। বাংলোতে বিদ্যুৎ থাকার কোনও প্রশ্নই নেই। আলো বলতে মোমবাতি। আলো জ্বালাবার ব্যাপারে জোর সাবধানতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে তাদের। কোনওমতেই যেন সে আলো বাইরে থেকে না বোঝা যায়। দিনের বেলাতে ঘরের ভিতরেই থাকতে হবে।

দু’জনের পরিবার থেকেই থানায় ডায়েরি হয়েছে। তাই দাসবাবু কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি হননি।

‘বাংলোটা আসলে একটা জেলখানা।’ জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল মনামি, ‘বাট অসাম! রেস্ট নেওয়ার জন্য এর চাইতে ভাল কিছু হয় না।’

‘দু’বেলা খিচুড়ি আর ডিমভাজা।’ মায়াঙ্ক মনামির কাঁধে হাত রেখে বলল, ‘স্টকে দেখলাম চাল-ডাল-তেল-নুন আর চা-বিস্কুট। বাট এনাফ। সাত দিন চলে যাবে। ভিতরের ব্যবস্থাটা সত্যি অবাক করার মতো। জল তোলার জন্য ব্রিটিশ আমলের হ্যান্ডপাম্পটা দিব্যি কাজ করছে। বাইরে বার হওয়ার দরকারই হবে না।’

‘আমি এসব ভাবছি না মায়াঙ্ক।’ মনামি স্মিত হেসে জানাল, ‘বৃষ্টিটা দেখো। ডিপ ইন দ্য ফরেস্ট উই আর।’

‘দাঁড়াও। তোমার একটা স্ন্যাপ নিই।’

‘প্লিজ, না।’ অস্ফুটে বলল মনামি।

মায়াঙ্ক কিছু না বলে চুপ করে তাকিয়ে থাকল। ঘরটা আবছা অন্ধকারে ভরে আছে। জানলার সামনে শুধু কিছুটা আলো। সে আলোয় মনামিকে দেখছিল মায়াঙ্ক। হালকা মেরুন রঙের টি-শার্ট আর সাদা বারমুডা পরে একটা পুরানো দিনের কাঠের চেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছে সে। দেখতে দেখতে ঝিম লেগে যায়। খুব রহস্যময়ী লাগে তাকে। এ মেয়ে যে কী ধাতুতে তৈরি, সেটা এখনও বুঝে উঠতে পারেনি মায়াঙ্ক।

‘বৃষ্টি দেখছ না?’ আচমকা মায়াঙ্কের দিকে তাকিয়ে হাসল মনামি, ‘রেইন ইজ আউটসাইড, নট হিয়ার।’ বলে নিজের বুকের উপর তর্জনী দিয়ে দুটো টোকা দিল সে, ‘আয়াম নট রেইন, তা-ই না?’

‘হু সেড?’ মায়াঙ্ক আলতো গলায় বলে, ‘একটা গানে শুনেছিলাম, বৃষ্টি হল নারী।’

‘দেন ইউ প্লিজ গেট ম্যান।’ বড় বড় চোখে দু’সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে ফিসফিসে গলায় উচ্চারণ করল মনামি। মায়াঙ্ক এগিয়ে এসে তার গাল দুটো দুই তালুতে নিয়ে ছোট ছোট চুমু খেল কয়েকটা।

‘বৃষ্টি দেখছ না?’ আচমকা মায়াঙ্কের দিকে তাকিয়ে হাসল মনামি, ‘রেইন ইজ আউটসাইড, নট হিয়ার।’ বলে নিজের বুকের উপর তর্জনী দিয়ে দুটো টোকা দিল সে, ‘আয়াম নট রেইন, তা-ই না?’

‘উই আর ভেরি ব্যাড, তা-ই না?’ মনামি চোখ দুটো বন্ধ করে। তার নিঃশ্বাস ঘন হতে শুরু করেছে। কথায় শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ মিশিয়ে সে বাক্যটা উচ্চারণ করল।

মায়াঙ্ক তার কানের লতিতে হালকা কামড় দিতে দিতে জবাব দিল, ‘ভেরি ব্যাড।’

‘অ্যান্ড ব্যাড গোজ এভরিহোয়্যার?’

টি-শার্টের ফাঁক দিয়ে স্তন বিভাজিকার উপর পড়ে থাকা লকেটটা দেখতে পাচ্ছে মায়াঙ্ক। সেটা আলতো করে তুলে এনে শার্টের উপরে রাখল সে। চোখ দুটো বন্ধই রেখেছে মনামি। সে অবস্থায় শরীরটা আরেকটু এলিয়ে দিয়ে মায়াঙ্কের চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে প্রশ্ন করল, ‘আনসার দিলে না তো?’

‘উই আর ব্যাড অ্যান্ড উই আর লাকি।’

‘রাইট। আমাদের শরীর দুটো আরেকটু হলে গুলিতে ফুটো ফুটো হয়ে যেত।’

‘কিন্তু তা হয়নি বেবি! শরীর দুটো ঠিকই আছে। উই শুড ইউজ আওয়ার বডি।’ বলেই এক হাতে মনামির ঘাড় জড়িয়ে তাকে মোক্ষম একটা চুমু খেল মায়াঙ্ক। মিনিটখানেকের বেশি লিপলক দশায় থাকার পর মনামি হঠাৎ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, ‘হয়ত একটু পরেই স্নাইপারের বুলেট আমাদের শেষ করে দিতে পারে!’

‘তা পারে। হয়ত এটাই শেষ রাত হতে পারে আমাদের।’ মায়াঙ্ক হাসে, ‘জীবন এখন আমাদের এমনই হবে। আর সেটা নিয়ে ভাবার দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না।’

‘বাট আই অ্যাম ফ্রি।’ একটা ধাক্কা দিয়ে

মায়াঙ্ককে সরিয়ে উঠে দাঁড়ায় মনামি। তারপর তার কলার ধরে অদ্ভুত হেসে বলে, ‘লেট মি এনজয় মাই ফ্রিডম! আমি এখন রানি! বাট কুইন অব ডার্কনেস!’

‘অ্যান্ড দ্য হটেস্ট কুইন এভার!’

কলারটা ছেড়ে দিয়ে কয়েক পা ধীরে ধীরে পিছিয়ে যায় মনামি। তারপর টি-শার্টটা খুলে ফেলে ছুড়ে দেয় কোথাও। মায়াঙ্ক স্তব্ধ হয়ে যায়।

‘অ্যান্ড ইউ আর মাই স্লেভ হিয়ার। সেক্স স্লেভ।’

‘উইদ প্লেজার।’

‘খোলো।’ ঘুরে গিয়ে মায়াঙ্কের দিকে পিঠ দিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে ব্রেসিয়ারের প্রতি ইঙ্গিত করল মনামি। খুব যত্ন নিয়ে কাজটা সম্পূর্ণ করল মায়াঙ্ক। তার নিশ্বাস সরাসরি পড়ছে মনামির পিঠে। মনামি ফিরল। দু’হাতের মুঠোয় চেপে ধরল মায়াঙ্কের চুল। চাপ দিয়ে মায়াঙ্ককে বসিয়ে দিতে দিতে সে হিসহিস করে বলল, ‘সাক মি বাস্টার্ড!’

দুরন্ত বৃষ্টিতে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে অরণ্য। তিলে তিলে বাড়ছে কালজানি নদীর জল। বাংলোর টিনের ছাদে জল আছড়ে পড়ার প্রবল শব্দে ঢেকে যাচ্ছে ওদের বিচিত্র শীৎকারমালা। মুক্তির অসহ্য আনন্দে এক নারী মোচড়ে মোচড়ে প্রকাশ করছিল তার যৌনতা। তার প্রতিটি হুকুম পালন করে এক দাস তাকে নিয়ে যাচ্ছিল অনন্ত আনন্দের দেশে। এই অদ্ভুত শৃঙ্গারে মত্ত রমণী যেন তার সমস্ত অতীত নিঃশেষে ক্ষরণ করে দেবে। রতিক্লান্ত, অবসন্ন শরীর থেকে জেগে উঠবে নতুন এক মনামি। তাই একটা সময় বিবস্ত্র মায়াঙ্ককে মেঝেতে ফেলে দিয়ে তার কোমরের দু’পাশে পা রেখে দাঁড়িয়ে মনামি হিংস্র আর হিসহিসে গলায় বলল, ‘তোকে রেপ করব!’

এক প্রচণ্ড রমণ অতঃপর ছাপিয়ে গেল বৃষ্টির উদ্দামতাকে। শীৎকারে শীৎকারে আরও ভারী হয়ে গেল বাতাস।

১১৭

দীননাথের রিসর্টের ঘটনা মিডিয়ায় ধুন্ধুমার আলোড়ন তুলে এখন একটু ঝিমিয়েছে। পুলিশ নতুন কোনও সূত্র না পাওয়ায় গোটা ব্যাপারটা থমকে আছে এখন। রিসর্টে যে রাতে প্রবল গুলির লড়াই হয়েছে, সেটা পুলিশ জানতে পারে পরদিন ভোরবেলায় দীননাথের ফোন পেয়ে। তারপর তদন্তে এসে তাদের চোখ গোল হয়ে যায়। লাশ পাওয়া গেছে চারটে। দু’জনের পরিচয় পাওয়া যায়নি, কিন্তু বাকি দুটোর একটা কাশিয়াগুড়িতে কন্যাসাথি এনজিও-র আড়ালে শিডিউল্ড ট্রাইব মেয়েদের পাচারচক্র চালাবার ফেরার নেত্রী শুক্লা দাস এবং আরেকজন হল খ্যাতনামা কেএলও জঙ্গি রাজা রায়। চারজনের শরীরেই মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্রের বুলেট পাওয়া গিয়েছে। তাই অনুমান করা হচ্ছে যে, মৃত চারজন একই দলের সদস্য। সেটা অবশ্য কেয়ারটেকার দীননাথকে জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হয়েছিল পুলিশ।

‘ফায়ারিং শুরু হতেই আমি বাংলোর দেয়ালের দিকে লাফিয়ে পড়ি। দেয়ালের আড়ালে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে যাই।’ হুইস্কির পাত্র নাড়াচাড়া করতে করতে দেবমালা বলতে থাকে, ‘তারপর ফায়ারিং থামে। শুক্লা দাসের টিম গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর দেখি, হামলাকারীর টিমটাও ফিরে যাচ্ছে। আসলে ওরা ফিরে যায়নি। লুকিয়ে নজর রাখছিল।’

দীননাথকে গ্রেপ্তার করলেও পুলিশ বুঝতে পেরেছিল যে সে নির্দোষ। কারণ রিসর্ট বুক যে করেছিল, সে পরিচয়পত্র জমা দিয়েছিল দীননাথের কাছে। সে পরিচয়পত্র জাল। ছবিও বেশ ঝাপসা। তার জবানবন্দি অনুসারে, রিসর্টে যারা ছিল, তাদের উপর হামলা করেছিল তিনজন লোক। তারা নদী পেরিয়ে পিছন দিয়ে এসেছিল। গুলির লড়াই থেমে গিয়েছে দেখে দীননাথ সাহস করে নদী পেরিয়ে রিসর্টে আসে। এসে দেখে যে কেউ কোথাও নেই। বাংলোর সামনে দুটো বডি পড়ে আছে। তারপর সামনের গেট দিয়ে দু’জনকে ঢুকতে দেখে সে লুকিয়ে পড়েছিল। কিন্তু লোক দুটো তাকে দেখে ফেলে। সেই মুহূর্তে নদী পেরিয়ে আসা লোকগুলো হাজির হয়। তারা একটা মেয়েকে ধরেছিল। কিন্তু সে মেয়েটা রিসর্টে থাকা দলের কেউ নয়।

এরপর সে মূর্ছা যায়।

লাটাগুড়িতে বন্ধুর রিসর্টে বসে ঝমঝমে বৃষ্টি দেখতে দেখতে এই গল্পই আলোচনা করছিলেন কনক দত্ত, পরি ঘোষাল আর দেবমালা। সে দিন রাতের ঘটনার পর এই প্রথম আড্ডার মেজাজে একত্র হয়েছিলেন তাঁরা। সামনেই রুদ্রমূর্তি ধারণ করে বয়ে যাচ্ছে মূর্তি নদী। পাহাড়ের দিকটা ঘন মেঘে ঢাকা।

‘তুমি ধরা পড়লে।’ দেবমালার দিকে তাকিয়ে বললেন কনক দত্ত, ‘তারপর থেকে ঠিক কী হয়েছিল, আরেকবার বলো তো!’

‘ফায়ারিং শুরু হতেই আমি বাংলোর দেয়ালের দিকে লাফিয়ে পড়ি। দেয়ালের আড়ালে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে যাই।’ হুইস্কির পাত্র নাড়াচাড়া করতে করতে দেবমালা বলতে থাকে, ‘তারপর ফায়ারিং থামে। শুক্লা দাসের টিম গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর দেখি, হামলাকারীর টিমটাও ফিরে যাচ্ছে।’

‘আসলে ওরা ফিরে যায়নি। লুকিয়ে নজর রাখছিল।’

‘একদম। আমি যখন সবাই চলে গিয়েছে ভেবে বেরিয়ে এসে নিজের মোবাইলটা খুঁজতে শুরু করি, তখন দুটো লাশ দেখতে পাই। মোবাইলটা খুঁজে পাওয়ার পর ভেবেছিলাম, বাংলোর ভিতরে ঢুকব। তখনই ধরা পড়ে যাই।’

‘ওকে।’ কনক দত্ত একটা চুমুক দিলেন, ‘পুলিশ আর মিডিয়া ভেবেছে দুটো দলের লড়াই। বাট আমরা একটা থার্ড পার্টি পেয়েছি। দে হ্যাড স্নাইপার। কিন্তু আমরা বেরিয়ে আসার পর যে লড়াই হয়েছে, সেখানে কেউ মরেনি।’

‘স্নাইপার কারা চালাল?’ পরি ঘোষাল একটু জড়ানো গলায় প্রশ্ন করলেন, ‘শুক্লা দাসের সাথিরা স্নাইপার নিয়ে ফিরে এসেছিল নাকি?’

‘সেটা সম্ভব নয়।’ কনক দত্ত জানালেন। দেবমালা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কনক দত্তর ফোন বাজছে দেখে থেমে গেল।

‘হ্যালো।’ ফোনটা ধরে বললেন কনক দত্ত। তারপর দু’-চারটে হ্যাঁ-হুঁ ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না তাঁর মুখ থেকে। ক্রমশ তাঁর কপালে ভাঁজ পড়তে লাগল। থমথমে হয়ে গেল গোটা মুখমণ্ডলটা। একসময় ‘থ্যাঙ্কিউ’ বলে ফোনটা টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থাকলেন।

‘এনিথিং রং?’

পরি ঘোষালের জিজ্ঞাসার উত্তরে বোতল থেকে খানিকটা তরল গেলাসে, তারপরে গলায় ঢেলে কনক দত্ত মুখ মুছে বললেন, ‘আজ কাশিয়াগুড়িতে নবেন্দু মল্লিকের বাড়ির উঠোনটা পুলিশ খুঁড়তে শুরু করেছিল। বডিটা পেয়েছে।’

‘শ্যামল?’ দেবমালা চমকে তাকাল।

‘আঙুলের হাড়ে আটকে থাকা আংটি দেখে ওর মা শনাক্ত করেছে।’ কনক দত্ত ম্লান সুরে জানালেন। কেউ কোনও কথা বলল না। বৃষ্টির মাতামাতির সঙ্গে এবার যোগ দিল হাওয়াবাহিনী। হুসহাস শব্দে এদিক-ওদিক বেঁকে যেতে শুরু করল জলের ধারা। একটা ধাক্কা একটু করে ভিজিয়ে দিয়ে চলে গেল ওদের তিনজনকে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

উত্তরঙ্গ তরঙ্গ

৫৪

কোজাগরীর রাতে পরিষ্কার আকাশ। তিস্তায় ভালই জল। পাহাড়ে বৃষ্টি হওয়ার কারণে ঘোলা জল পাক খেয়ে নেমে আসছে সমতলে। পুরো নদীটাই ভরে আছে। ফটফটে জ্যোৎস্নার নিচে বয়ে যাওয়া নদীটার দিকে তাকিয়ে থাকলে কেমন জানি ছমছমে অনুভূতি হয়। ছই দেওয়া বড় নৌকোটা চাঁদের আলোতে কালো দেখাচ্ছিল। ভাটির স্রোতে বয়ে এসে সেটা ঢুকছিল করলার দিকে। পুলিশের নৌকো সেটাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসছে। একজন হাবিলদার হাঁক দিলেন, 'কৌন হ্যায়?'

'জোতদার বর্মন হ্যায়। হাস্পিটাল জানা হ্যায়।'

'বুখার?'

'বহোত কাঁপতা হ্যায়। কুইনাইন ভি কাম নেহি করতা সাব!'

পুলিশের নৌকো এগিয়ে এল। সত্যিই ছইয়ের ভিতরে একজন লোক ঠকঠক করে কাঁপছে। মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি। তাকে জলদি হাসপাতালে ভরতি করে দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে পুলিশের নৌকো আবার ফিরে গেল তিস্তা-করলার সংগমস্থলে। ছই নৌকোটি এগিয়ে চলল করলা বেয়ে উত্তর দিকে। কিছুটা পথ যাওয়ার পর বাবুঘাটে আলো দেখতে পেল নৌকোর আরোহীরা। ম্যালেরিয়ায় কম্পমান রোগী এবার কম্বল থেকে বেরিয়ে এসে নিচু গলায় বললেন, 'ঘাটে লাগা।'

'এখানে নামবেন?' পাশে বসে থাকা লোকটি উদ্‌বেগের সুরে জিজ্ঞেস করে, 'সামনেই থানা। রাজবাড়ির ঘাটে নামবেন বলেছিলেন, সেটাই তো ভাল ছিল!'

'টাউন এখন শান্ত।' রোগী গামছা দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে বললেন। নৌকো ঘাটে লাগল। সামনেই বাবুপাড়া। বেশ সম্পন্ন পাড়া। রাস্তায় আলো জ্বলছে। গাছপালা আর বাগানে সাজানো সুন্দর বাড়িঘর। লোকজন হাঁটাচলা করছে। এ বাড়ি-ও বাড়ি থেকে ভেসে আসছে শঙ্খ এবং উলুধ্বনি। একখানা মোটরগাড়িও দেখা গেল দাঁড়িয়ে আছে। পাড়ার দু'-তিনজন মাতব্বর গোছের ব্যক্তি ঘাটের সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন। নৌকো থেকে নেমে আসা আগন্তুককে দেখে তাঁদের একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'মশাই যাবেন কোথায়?'

'আজ্ঞে, বীরেনবাবু বাড়ি। সামনেই তো, তা-ই না?'

'ওই তো, মোড়ের মাথায় দেখা যাচ্ছে।' একজন হাত তুলে দিকটা দেখিয়ে দিয়ে জানালেন,

'তা বীরেনবাবু বুঝি আত্মীয় হয়?'

'সে সৌভাগ্য কি আর আমার আছে?' ভারী বিনয়ের সঙ্গে রোগী অথবা আগন্তুক বললেন, 'আমি তাঁদের প্রজা। ফি-বছর কোজাগরীর দিন কিছু খাজনা নিয়ে আসি। বাবুর অতিথিশালায় দু'দিন থেকে একটু টাউনের মজা নিই। তারপর ফিরে যাই।'

'বটেই তো, বটেই তো!' তাঁরা সমস্বরে জানালেন, 'তা মজা নেবেন বইকি! মজা করতে চাইলে কোনও সমস্যা নেই। পলিটিক্স নিয়ে না মাতলেই হল!'

সমস্বরে অট্টহাস্য করে কথাটা শেষ করলেন তাঁরা। আগন্তুক একটু অপেক্ষা করলেন তাঁদের হাসি থামার জন্য। তারপর আগের মতোই বিনয়ী গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কি পলিটিক্সের লোক? কংগ্রেস করেন বুঝি?'

'খেপেছেন মশাই?' ফ্যাচ করে হেসে বললেন একজন, 'সুখে থাকতে ভূতের কিল কে খেতে যাবে? তা মশাইয়ের নামটা শুনিনি কিন্তু!'

'আজ্ঞে, তারিণী বর্মন। আসছি। নমস্কার।'

আগন্তুক হাঁটা দিলেন। কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। পারার কথাও নয়। ছদ্মবেশ ধরতে তিনি ওস্তাদ। নিজের নামটা ঠিক বললেও পদবি তাঁর বসুনিয়া। অনেকদিন পর জলপাইগুড়ি টাউনে পা রাখলেন তিনি। পুলিশ তাঁকে এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছে। রথের হাটে নিজের বাড়িতে তাই ফেরা হচ্ছে না তাঁর। এই অবস্থায় জলপাইগুড়িতে আসার ঝুঁকি তিনি একটি বিশেষ কারণে নিয়েছেন। উপেনের সঙ্গে দেখা করার জন্য বীরেন আর গগনেন্দ্র অপেক্ষা করে আছে, সে খবরটা পেয়েছেন তিনি। এই সাক্ষাতে যে তাঁর খুব একটা সম্মতি আছে, এমন নয়। কিন্তু বীরেন আর গগনেন্দ্রকে বাধা দিয়েও লাভ নেই। বদলে তাদের দিয়ে একটা কাজ হয়ে যাবে এ যাত্রায়।

তারিণী বসুনিয়া দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগলেন। বীরেনের বাড়ির সামনে বাঁশ লাগিয়ে কয়েকটা পেট্রোম্যাক্স ঝোলানো হয়েছে। সে আলোতে ঝলমল করছে চারপাশ। এ বাড়িতে লক্ষ্মীদেবীর বড় প্রতিমা এনে পুজো করা হয়। বাড়িতে বেশ লোকজনের ভিড়। তারিণী বসুনিয়া একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বিড়ি ধরালেন। হিম পড়া শুরু হয়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ খোলা আকাশের নিচে থাকলে চুল ভিজে যায়। বিড়ি টানতে টানতে তারিণী বসুনিয়া বীরেনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

একটু পরেই বীরেন বাড়ির ভিতর থেকে দু'-তিনটে সমবয়সি ছেলের সঙ্গে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল। তারিণী বসুনিয়া দেখলেন যে, সেই ছেলেগুলোর মধ্যে একজন গগনেন্দ্র। গগন বাদে বাকি ছেলেগুলো একটু পরেই বিদায় নিল। তারিণী বসুনিয়া গাছের তলা থেকে এগিয়ে গেলেন বীরেনের দিকে।

'এই যে বীরেনবাবু!'

তাঁকে ডাকছে শুনে বীরেন ঘাড় ঘুরিয়ে তারিণী বসুনিয়াকে দেখল। চিনতে না পেরে একটু বিস্ময় মাখানো সুরে বলল, 'আমাকে ডাকছেন?'

'আপনার সঙ্গে ইনি তো গগনবাবু, তা-ই না?' তারিণী বসুনিয়া কাছে এসে বললেন। গগনেন্দ্র এবার অবাক হা। যদিও টাউনে পরিচয় জানাটা খুব সহজ। কিন্তু আগন্তুক ব্যক্তিটির বেশভূষা আর কথাবার্তা মোটেই মিলছে না।

'আমরা কিন্তু আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না।' বীরেন একটু হেসে বলল, 'এ টাউনেই বাড়ি আপনার? পুজো কিন্তু হয়ে গিয়েছে— প্রসাদ নিয়েছেন?'

'দুটো কথা ছিল বীরেনবাবু।' তারিণী গলা নামিয়ে বললেন, 'কোথাও নিরিবিলিতে একটু বসা যায় কি?'

'আজ তো পুজোর দিন।' বীরেন একটু ইতস্তত করে, 'বৈঠকখানাতে লোকজন ভরতি। খুব জরুরি ব্যাপার কি?'

'উপেনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। সে বিষয়ে কিছু কথা ছিল।'

ওরা দু'জন কয়েক সেকেন্ড তারিণী বসুনিয়ার মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকল। তারপর বীরেন বলল, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

গগনেন্দ্র ভেবেছিল যে, বীরেন বাড়ির ভিতরে ঢুকবে। কিন্তু তার বদলে সে হাঁটতে শুরু করেছে রাস্তার দিকে। বাধ্য হয়ে সে জিজ্ঞেস করল যে, বীরেন কোন দিকে যাচ্ছে। 'করলার ধারে চলো।' জানাল বীরেন। গগনেন্দ্র বুঝতে পারল যে, বীরেন একটা ফাঁকা জায়গা খুঁজছে। অবশ্য পাড়া থেকে বেরিয়ে কয়েক পা হাঁটলে তেমন জায়গার কোনও অভাব নেই। তবে আজকের দিনটা বিশেষ দিন। কোজাগরী আর ভরা চাঁদের আলোর কারণে টাউনের লোকজন এখানে-সেখানে জড়ো হয়ে গল্পগুজব করছে। দেখা গেল, নদীর পাড়েও তাদের অভাব নেই। বীরেনকে দেখে তাদের কেউ কেউ ডাকাডাকি শুরু করে দিল।

'এভাবে ঘোরাঘুরি করতে আমার অসুবিধে আছে বীরেনবাবু।' তারিণী বসুনিয়া মৃদুস্বরে বললেন, 'ভাল হয় বাবুঘাটে গিয়ে আমার নৌকোয় বসলে।'

'আপনার নৌকো?' বীরেন একটু সন্দেহের চোখে তাকায়, 'আপনাকে কে পাঠিয়েছে?'

'নৌকোয় বসেই সেটা শুনবেন। আসুন।'

গলার স্বরে স্পষ্ট নির্দেশ। সে নির্দেশ ওরা উপেক্ষা করতে পারল না। অজানা আগন্তুক নির্দেশ দিয়েই হাঁটতে শুরু করেছে ঘাটের দিকে। মাতব্বররা তখনও তাঁদের গালগল্প চালিয়ে যাচ্ছিলেন সেখানে। আগন্তুককে ফিরে আসতে দেখে তাঁদের একজন বললেন, 'কী মশাই? ফিরে এলেন যে?'

'বাবুদের শখ হয়েছে নৌকোয় ঘুরবেন।' তারিণী বসুনিয়া আবার বিনয়ের অবতার হয়ে জানালেন, 'ওই ওঁরা আসছেন।'

মাতব্বরদের চোখের সামনে দিয়েই বীরেন আর গগন ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। তাঁরা কিছু জানতে চাইলেন না আর। আসলে বীরেনকে এলাকার লোকজন খুব একটা ঘাঁটায় না। তবে তাঁরা নৌকোয় গিয়ে বসার পর একজন মাতব্বর ফিসফিস করে বললেন, 'বীরেনের সঙ্গে ওটা খুদিদার জামাইটা না? দু'জন তো ইদানীং হরিহর আত্মা হয়েছে।'

নৌকোর ছইটা বেশ বড়। বীরেন আর গগনেন্দ্রকে নিয়ে আগন্তুক তার ভিতরে গিয়ে বসলেন। সেখানে একটা বিছানা পাতা। একপাশে টিমটিম করে একটা লণ্ঠন জ্বলছিল। আগন্তুক লণ্ঠনটা একটু উসকে দিলেন। বাইরে অবশ্যি আলোর বন্যা বইছিল তখন।

'বীরেনবাবুর সঙ্গে আমার বাক্যালাপ হয়নি।' আগন্তুক আবার একখানা বিড়ি ধরালেন, 'কিন্তু গগন যখন আমাকে চিনতে পারেনি, তখন ধরে নিচ্ছি যে, আমার ছদ্মবেশটা মন্দ হয়নি।'

'আমি আপনাকে চিনি?' গগন প্রবল কৌতূহলী স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় আলাপ হয়েছিল, বলুন তো?'

'সে কী!' আগন্তুক হাসলেন, 'উপেনের খবর দেশলাইয়ের বাক্সে ভরে এনে দিয়েছিলাম— মনে নেই?'

গগনেন্দ্র বেজায় চমকে উঠল। কাঁচাপাকা দাড়িতে ভরা আগন্তুকের ক্লিষ্ট মুখের দিকে হাঁ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ঢিপ করে তাঁকে একটা প্রণাম করে রুদ্ধস্বরে বলল, 'আপনি? সত্যিই চিনতে পারিনি।'

তারপর হতভম্ব বীরেনের দিকে তাকিয়ে উজ্জ্বল চোখে বলল, 'তারিণী বসুনিয়া। চিনলে তো?'

'আপনি তারিণী বসুনিয়া?' বীরেনের গলার স্বরও রুদ্ধ হয়ে যায়, 'আপনাকে তো পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে!'

নৌকো চলতে শুরু করেছে। করলার জল মৃদু গতিতে বয়ে চলেছে তিস্তার দিকে। সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে নৌকোটা চলছিল তিরতির করে। কোজাগরী পূর্ণিমার চাঁদ তার সর্বস্ব ঢেলে দিয়েছে নদীর উপর। অপার্থিব সৌন্দর্যে ভরে উঠছিল চারপাশ। কিন্তু নৌকার আরোহীদের কাছে তখন সৌন্দর্য উপভোগের সময় কোথায়?

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: দেবরাজ কর

ডুয়ার্স থেকে শুরু

তিড়িং বিড়িং পিড়িং পিড়িং

সদ্য হাতে এসেছে কম্পিউটার। তার রহস্য ভেদ করতেই চলে যাচ্ছে সময়। নিজের উৎসাহে ভিডিয়ো এডিটিং-এ হাতেখড়ি। লেখক একদা গিটার নিয়ে পিড়িং পিড়িং করলেও এমন একজনের দেখা পেলেন, যার বাজানো শোনার পর নিজের গিটার রেখে দিতে ইচ্ছে হয়। সে বাজিয়ে আবার একটা ফিল্মে মিউজিকও করেছে। ছবির নাম ‘কালী আমার মা’। অতঃপর সে বাজিয়ের জন্য ভিডিয়ো তৈরি করলেন লেখক এবং সেটাই ছিল তাঁর প্রথম সম্পাদনার কাজ। ফলাফল কী হল? সঙ্গে এক গোলমেলে রেকর্ডিস্টের গপ্প। চরৈবেতি।

সামনাসামনি বসে যে দিন সুরজিতের গিটার বাজানো শুনেছিলাম, তারপর থেকে আমার নিজের গিটার বাজানোর বারোটা বেজে গেল। কারণ, ওর আঙুলের ঝোড়ো জাদু আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল যে, আমি যেটুকু বাজানো জানি, সেটা বালখিল্যের চেয়েও বালখিল্য।

সত্যটি মালুম হতে প্রথমে একটু হতাশ লাগছিল ঠিকই। কিন্তু তারপর ভেবে দেখলাম, যতটুকু শিখেছি, সে তো হাতড়ে হাতড়ে নিজের প্রচেষ্টায়। সুতরাং ঠিকঠাক তালিম নিলে নিশ্চয় ভবিষ্যতে উন্নতির সুযোগ আছে। তবে, জীবনে তখন ঢুকে পড়েছে কম্পিউটার। প্রতিদিন তার নতুন নতুন রহস্য আবিষ্কার করতেই হাতের সবটুকু ফাঁকা সময় কখন যে ফুড়ুৎ হয়ে যায়, কিছুতেই টের পাই না। তাই আমি ঠিক করলাম, যতদিন পর্যন্ত না সময় করে তালিম নেওয়া শুরু করতে পারছি, গিটার ততদিন তোলাই থাক।

‘ভূমি’ ব্যান্ড তখন সবে একটি কুঁড়ির আকার ধারণ করেছে। জগতের জল-বাতাস থেকে ইন্ধন শুষে নিয়ে পুষ্ট হচ্ছে একটু একটু করে। আর আমি, একটি ইংরেজি বিজ্ঞাপনের জিঙ্গল লিখে মিউজিক ডিরেক্টর খুঁজছিলাম সেটার সুর করাব বলে। প্রথিতযশা কোনও সংগীত পরিচালকের কাছে যাওয়ার মতো বাজেট নেই। তাই নতুন কাউকে খুঁজছিলাম। সম্ভব হলে যে হবে আমার নিজের বয়সি কেউ।

এইসব পরিস্থিতিতে আমার জন্য নিশ্চিত ত্রাণকর্তা একজনই ছিল তখন। সাউন্ড উইং স্টুডিয়োর সাউন্ড রেকর্ডিস্ট রাজীবদা। বর্তমান বলিউডের বিখ্যাত বাঙালি মিউজিক ডিরেক্টর প্রীতমের চেহারাটা মনে করুন। আর তার চোখ দুটোকে উৎপল দত্তর মতো ছানাবড়া গোল করে ভারী ফ্রেমের প্রকাণ্ড চশমা দিয়ে দিন তাতে। ব্যাস, এটাই হল রাজীবদা। কপাল-ঢাকা চুল এবং জঙ্গুলে ঘন দাড়ির মালিক এই ব্যক্তিকে প্রথম দর্শনে মনে হয়েছিল সাংঘাতিক রাশভারী। কিন্তু অন্তরটি আবিষ্কারের পর যথারীতি, বিস্ময়ের শেষ নেই!

সুরজিতের প্রসঙ্গে ফিরব, কিন্তু তার আগে রাজীবদা সম্বন্ধে দু’-এক কথা বলা যাক। প্রথমবার তার স্টুডিয়োতে যাই একরাতে, আমার তৎকালীন বস সৌগতদার সঙ্গে। রাত দশটার সময় একটি জিঙ্গলের ভয়েস ডাব হচ্ছিল। রেকর্ডিং কনসোলে বসে ইন্স্ট্রাকশন দিয়ে চলেছে রাজীবদা। সে কী গুরুগম্ভীর গলা। একদম কালবৈশাখীর সঘন মেঘের স্কেল, যেন মেপে বসানো গলাতে।

স্টুডিয়োর রিসেপশনের দেয়ালে টাঙানো ফোটোগ্রাফ আর অ্যালবাম কভারগুলোয় একটু আগেই দেখে এসেছি যে, এই লোকটি একসময় কিশোরকুমার, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো মহারথীদের সঙ্গে কাজ করেছে। তাই খুব ইচ্ছে হচ্ছিল যে, আলাপ করি। কিন্তু একদমই আনকোরা আমি, সেই ব্যক্তিত্বের সামনে মুখ খুলতে একেবারেই ভরসা পাচ্ছিলাম না। সুতরাং কাজে ব্যস্ত রাজীবদার আমাকে আলাদা করে লক্ষ করার কোনও কারণও ছিল না। তবে ভাগ্যক্রমে, মাঝে একটা গিটারে পিড়িং পিড়িং করতে গিয়ে, সে অচলাবস্থা অচিরেই কেটে যায়! সেই সময় ভারতের বিজ্ঞাপনজগতে সদ্য সদ্য দুর্দান্ত রং নিয়ে এসেছে একটি চকোলেট ব্র্যান্ডের জিঙ্গল— 'কুছ খাস হ্যায়, হম সবহি মে...'। অগলভি অ্যান্ড ম্যাথার বিজ্ঞাপন এজেন্সির ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর পীযূষ পান্ডের একদম প্রথম দিককার এক অনবদ্য সৃষ্টি। ব্যাটসম্যান ম্যাচ উইনিং ছক্কা হাঁকাতেই ক্রিকেট মাঠে চকোলেট হাতে এক তরুণী ঢুকে পড়ে উদ্দাম নাচতে শুরু করে সেই গানের সুরে। আর গানটি ভারত জুড়ে জনতার মুখে মুখে সুপারহিট।

বলতে দ্বিধা নেই, ঠিক সেই গানের অনুকরণেই সৌগতদা কলকাতার এক বিখ্যাত জুতোর ব্র্যান্ডের জন্য হিন্দি জিঙ্গল বানিয়েছিল, যেটার ডাবিং চলছিল সেই রাতে। গায়ক একদমই নতুন একটি ছেলে। কারণ ওটা ছিল গানের স্ক্র্যাচ রেকর্ডিং। অর্থাৎ, সেটা শুনে যদি ক্লায়েন্টের পছন্দ হয়, তবে পরে কোনও নামী গায়ককে দিয়ে ফাইনাল ডাব করা হবে।

রেকর্ডিং-এর আগে ফুল মিউজিক ট্র্যাকের সঙ্গে একবার-দু'বার মনিটর হওয়াটাই রেওয়াজ। গায়ক মাইকের সামনে গাইবে আর রেকর্ডিস্ট সেই সময় নানা রকমের সুইচ এবং নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেই কণ্ঠস্বরে কয়েক পোঁচ রং চড়াবে। রাজীবদা সেই কম্মটি করতে করতে ক্রমশ গম্ভীর মানুষ থেকে বদলে যেতে শুরু করল। এবং অতি শীঘ্রই তার রূপান্তর ঘটে গেল এক খোশমেজাজি বিরাট শিশুতে। কখনও মাথা ঝাঁকিয়ে, কখনও টেবিলে তাল বাজিয়ে এবং কখনও ভুঁড়ি দুলিয়ে দুলিয়ে বসা অবস্থাতেই রাজীবদা অল্প অল্প নাচতে লাগল। গায়ক ছেলেটি হিন্দিভাষী। টক ব্যাক মাইকে তার উদ্দেশে ঘন ঘন হুংকারও চলতে লাগল, 'আরে, বিল্লিকা মাফিক মিয়াঁও মিয়াঁও কিউঁ করতা? সিংহকা মাফিক ঘিয়াও ঘিয়াও চাই। আর মুখটা তুমি আরও বড় করকে হাঁ করো বাপধন!'

পরমুহূর্তে টক ব্যাকের সুইচ অফ করে সৌগতদার উদ্দেশে তার উক্তি, 'আরে, ভিতরে যা, ওটাকে গিয়ে হাঁ করতে শেখা। নাকের ফুটোর সাইজের মুখের ফুটো করছে কেন? ও দিয়ে গাইলে, গানের তেইশটা বেজে যাবে!'

এইসব সংশোধনী কার্যকলাপ চলতে চলতে একটা টি-ব্রেক-এর সময় হয়ে গেল। ডাবিং ফ্লোরের এক কোণে রাখা একখানা অ্যাকস্টিক গিটার অনেকক্ষণ থেকেই নজর করছিলাম আমি। তখন ফাঁক পেয়ে, সেটা হাতে তুলে নিয়ে কিছুটা বিদ্যা জাহির করা শুরু করলাম। 'হোটেল ক্যালিফোর্নিয়া'র প্রিলিউড মিউজিকটা বেশ ভালই বাজাতে জানতাম। সেই কর্ডগুলো ধরতেই রাজীবদা কৌতূহলী চোখে আমার দিকে ঘুরে তাকাল। তারপর চায়ের কাপে চুমুক দেয়া মাঝপথে থামিয়ে বলল, 'বাঃ! চালিয়ে যাও। চালিয়ে যাও!'

আমিও মহা উৎসাহে চালিয়ে গেলাম। একটাও বিট মিস না করে কমপ্লিট করে ফেললাম পুরো প্রিলিউড। আর রাজীবদা, চায়ের চুমুকটা কমপ্লিট করে এবার জিজ্ঞেস করল, 'কী যেন তোমার নামটা বললে তখন ভাই? আরেকবার বলো, প্লিজ।'

তো, মাস ছয়েক বাদে সেই রাজীবদাকেই যখন ফোন করছি মিউজিক ডিরেক্টরের খোঁজে, ততদিনে তার সঙ্গে অনেকটাই ঘনিষ্ঠতা। মানে, 'তুমি' থেকে 'তুই' সম্বোধনে চলে এসেছে। তবে মনোহরপুকুর রোডের সাউন্ড উইং স্টুডিয়ো ছেড়ে তখন তার ঠিকানা হয়েছে নাকতলায় বান্টি সিনেমা হলের কাছে স্টুডিয়ো শ্রুতিতে। আমার প্রয়োজনের কথা শুনে রাজীবদা সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'দারুণ সময়ে ফোন করেছিস রে। এখানেই একটা লোকাল ছেলের সঙ্গে ক'দিন হল আলাপ হয়েছে। মনে হচ্ছে, তোর কাজটায় ভাল ফিট করবে।'

—পারবে বলছ? আমার কিন্তু ইংরেজি জিঙ্গল...

—পারবে না মানে? ব্যাপক ভাল গিটার বাজায় পিঙ্কু।... আর তারপর একটা ফিল্মেরও মিউজিক ডিরেক্ট করেছে, এই অল্প বয়সেই!

—ফিল্মও? তাহলে তো দারুণ ব্যাপার। কী নাম ফিল্মের?

আমার এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে, প্রথমে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল রাজীবদা। তারপর একটু থেমে থেমে বলল, কালী... আমার... মা!

নাম শুনে আমি একেবারে থ! এ যে পুরো অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স! শোনামাত্রই মনে হয়েছিল, আমার ইংরেজি জিঙ্গলে শেষে শ্যামাসংগীতের সুর হয়ে যাবে না তো?

পিঙ্কু ওরফে সুরজিতের সঙ্গে আলাপ হল পরদিন, ওই স্টুডিয়ো শ্রুতিতেই। ওরকম স্লিম, লম্বা এবং স্মার্ট চেহারার মিউজিক ডিরেক্টরের হাতে গিটারটা ভাল মানায়। প্রথম দর্শনে তাই অবাক হয়ে ভাবছিলাম, এ কী করে 'কালী আমার মা' ছবির সংগীত পরিচালক হল? এবং সেই প্রশ্নটা করেও ফেললাম। আর সেই সূত্রেই জানতে পারলাম যে, ওর নাড়া-বাঁধা অনেকটাই সম্পন্ন হয়েছিল 'মহীনের ঘোড়াগুলি'খ্যাত গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। ফলে ওয়েস্টার্নের সঙ্গে সঙ্গে দেশি লোকসংগীতের উপরেও ওর যথেষ্ট দখল। পরবর্তী সময় 'ভূমি' ব্যান্ডের গানগুলোতেও যে মেঠো আর সহজ সুরের খেলা ওর বৈশিষ্ট্য এবং নিজস্বতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গল্প করতে করতে অদ্ভুত সারল্যের সঙ্গে সে দিন সে বলেছিল, 'আসলে বাবার ইচ্ছে ছিল যে, মেয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইবে, আর ছেলে তার সাথে বসে তবলা বাজাবে। তাই দিদি গান শিখেছিল আর আমার মিউজিকে হাতেখড়ি তবলা দিয়ে। তারপর অবশ্য কলেজলাইফে গিটারের নেশা ধরল মণিমামার (গৌতম চট্টোপাধ্যায়) কারণে।'

আমিও ওর সঙ্গে শেয়ার করলাম প্রায় একই বয়সে আমার অভিজ্ঞতার কথা, যা কিছু দূর অবধি অদ্ভুতভাবে ওর সঙ্গে মিলে যায়। জলপাইগুড়ি বইমেলায় সেবার বিচিত্র এক স্টল নিয়ে এসেছিল কলকাতা আর্ট কলেজের দুই ছাত্র সন্দীপন এবং মিলন। আমার চেয়ে বেশ কয়েক বছরের বড় হলেও, দারুণ দোস্তি জমে গিয়েছিল তাদের সঙ্গে। আর সেই সময় ওদের মুখে শুনেই মুখস্থ করে নিয়েছিলাম অনেকগুলো অন্য স্বাদের গান। বহু পরে জানতে পারি যে, সেগুলি সবই গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের সৃষ্টি। বিশেষত সেই গানগুলির আকর্ষণে, আমিও কিন্তু গিটার শেখার ব্যাপারে আদা-জল খেয়ে লেগে পড়েছিলাম।

যা-ই হোক, আমার ইংরেজি জিঙ্গলটায় সুর করল সুরজিৎ। এবং রাজীবদার তত্ত্বাবধানে গানটা রেকর্ডও হল ওরই গলাতে। তবে গানের সূত্রে আলাপ এবং

> রাতভর সে দিন গিটার বাজিয়ে একের পর এক গান গেয়ে চলল সুরজিৎ, যার শুরুটা 'বারান্দায় রোদ্দুর' দিয়ে। এবং তারপরে মজার প্রেমের গানের সেই লাইনগুলো... 'কইন্যা আমার হৃৎপিণ্ড... তিড়িং বিড়িং করে...'

বন্ধুত্ব হলেও, কয়েকদিন পরে কিন্তু সুরজিৎ সম্পূর্ণ অন্য একটি কারণে আমাকে অবাক করল। কারণ, সে দিন ও আমায় ফোন করে বলল, আমি একটা সিনেমার স্ক্রিপ্ট লিখেছি। একটু দেখবে, ওটা থেকে যদি কোনও টেলিফিল্ম করা যায়? মনে বিরাট কৌতূহল ফুলেফেঁপে উঠল। কতক্ষণে দেখব, সেটা ভেবেই তখন অধীর অবস্থা! দিন দুয়েকের মধ্যে হাতে চলে এল স্পাইরাল বাইন্ডিং করা প্রকাণ্ড মোটা স্ক্রিপ্টখানা। গল্পের নাম 'রং নাম্বার'। এবং, সেটাই আমার জীবনে প্রথমবার একটি পূর্ণাঙ্গ সিনেমার স্ক্রিপ্ট চোখে দেখা এবং হাতে নিয়ে পড়া। পুরো গল্পটা আজ মনে নেই। তবে এটা মনে পড়ছে যে, খুব মজাদার এক জোড়া চোরের চরিত্র ছিল গল্পে, যাদের ডায়ালগগুলো পড়ে প্রাণ খুলে খুব হেসেছিলাম একা একাই। এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও ভেবে অবাক হয়েছিলাম যে, আমার উত্তরবঙ্গের অনেক প্রিয় বন্ধুর ছায়া দেখতে পাচ্ছি এই নতুন বন্ধুটির মধ্যে। ওর প্রাণশক্তি আর খাদ্যপ্রীতি মনে করায় জয়কে। ওর লেখা মজার ডায়ালগগুলো মনে পড়ায় শুভ্রকে। ইত্যাদি ইত্যাদি!

যা-ই হোক, ওই ছবিটা হয়নি। তবে তখন পরপর অনেকগুলো অ্যাড ফিল্ম করার সুযোগ পেলাম, যার সব ক'টাতেই মিউজিক করেছিল সুরজিৎ। ম্যাক্সমুলার ভবনে ওদের আড্ডা, বালিগঞ্জে সোমুর বাড়িতে 'ভূমি'র রিহার্সাল এবং পার্ক হোটেলে 'ভূমি'র প্রথম পাবলিক পারফর্মেন্স... সবখানেই আমার উপস্থিত থাকার সুযোগ হয়েছিল সুরজিতের আমন্ত্রণে। আর সুরজিৎই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল ওর আরেক বন্ধু রাজার সঙ্গে। সে চিত্রবাণীতে সিনেমাটোগ্রাফি নিয়ে পড়াশোনা করেছে। অচিরেই এরপর আমার সমস্ত প্রোজেক্টে ক্যামেরার কাজে মোটাসোটা এবং মজাদার চেহারার রাজার জড়িয়ে পড়া শুরু হয়ে গেল। আর আমাদের এই তিনজনের টিমে, ব্যবস্থাপনার যাবতীয় দায়িত্বে যোগ হল চতুর্থজন... শ্রীমান রাজু। যে রাজু দরকষাকষি করতে গিয়ে হামেশাই টিমমেটদের বিকিয়ে দেয়। আমাদের পছন্দ যে লোকেশন বা স্টুডিয়ো, কাজের দিন দেখা গেল, রেট কমাতে গিয়ে রাজু তার বিকল্প অন্য কোনও ব্যবস্থা করে বসে আছে। শেষ মুহূর্তে সে কখন কোথায় কী অদলবদল করে দেবে, তার হদিশ পাওয়া যেত না বলে, রাজা সব থেকে বেশি টেনশনে ভুগত। একদিন তাই বলেই বসল, 'রাজুর সঙ্গে কাজ করতে হলে সবসময় মাথায় করে একটা কমোড ক্যারি করে বেড়ানো দরকার। এমন টেনশন দেয়... যখন-তখন আমার নিম্নচাপ চেপে যায়... বাপ রে!'

আগেই বলেছি, কম্পিউটার ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে সেই সময় আমি গিটার থেকে বিচ্ছিন্ন। আর যেরকম নিজে নিজে হাতড়ে একদা গিটার শিখেছিলাম, সেরকমভাবেই আমি তখন কম্পিউটারকে কবজা করার কঠিন কাজটি করে চলেছিলাম। এডিটিং, অ্যানিমেশন আর সাউন্ড রেকর্ডিং... তিনটে বিষয়েই প্রবল আগ্রহ আমার। সফ্টওয়্যার জোগাড় করা এবং 'হেল্প' পড়ে পড়ে সেগুলো শেখা চলছিল একদিকে। আরেক দিকে এই সফ্টওয়্যার চালানোর যোগ্য একটা কম্পিউটার সিস্টেম অ্যাসেম্বল করতে গিয়ে হার্ডওয়্যারটাও শিখতে হচ্ছিল অল্পবিস্তর। সে সময় হার্ড ডিস্কের ক্যাপাসিটি হত দু'শো থেকে চারশো এমবি। কম্পিউটারে ষোলো এমবি র‍্যাম থাকা মানে বিরাট ব্যাপার। আর ফ্লপি ডিস্কের যুগ ফুরিয়ে সবে সবে সিডি রম এসেছে। কিন্তু ওই মান্ধাতার যুগের মেশিনেও আমি দিব্যি মাল্টিমিডিয়া নিয়ে যথেচ্ছ এক্সপেরিমেন্ট চালাতাম।

আমার বাড়ির কম্পিউটারে এডিটিং করা যায় জেনে এবারে সুরজিৎ আর রাজা একদিন এসে বলল, একটা মিউজিক ভিডিয়ো এডিট করে দিতে হবে। রাজার নিজের একটা ভিডিয়ো ক্যামেরা ছিল। তা-ই দিয়ে বাড়ির ছাদে সুরজিতের একটা গান শুট করেছে প্রায় ছ'মাস আগে। কিন্তু স্টুডিয়োতে এডিট করতে প্রচুর খরচ বলে ব্যাপারটা তারপর ওইটুকুতেই থেমে রয়েছে। ওরা আমায় জিজ্ঞেস করল, পারবে তুমি এডিট করে দিতে?

তার আগে অবধি রিয়্যাল ফুটেজ আমি কখনও এডিট করিনি। মানে, কোনও উপায়ে রিয়্যাল ফুটেজ জোগাড়ই করে উঠতে পারিনি। রাত জেগে জেগে থ্রি-ডি স্টুডিয়ো নামক অ্যানিমেশন সফ্টওয়্যারে যা খুশি তা-ই বিটকেল বিটকেল অ্যানিমেশন বানাতাম। আর তারপর অ্যাডোবি প্রিমিয়ার সফ্টওয়্যার মিউজিকের সঙ্গে সেই ক্লিপগুলো জুড়ে জুড়ে ততোধিক কিম্ভূতকিমাকার চলচ্চিত্র তৈরি করতাম। সুতরাং এই প্রস্তাব পেয়ে তো আমার একেবারে আনন্দে আত্মহারা দশা।

রাজা শুট করেছিল ভিডিয়ো টেপ-এ। সেই ফুটেজগুলো একটা ভিসিডি বানিয়ে আমায় দিয়ে গেল একদিন। সুরজিতের গানটা ছিল 'এলোমেলো পথ, বাকি রয়ে যায়...।' আর শুট করা ছবিগুলোও ছিল রীতিমতো এলোমেলো। কিন্তু হাত পাকাবার পক্ষে সেটাই যথেষ্ট। সারাদিন অফিস সেরে এসে, বেশ কয়েক রাত ধরে আমি সেগুলোকে গানের সঙ্গে সাজালাম। আর সাজাতে সাজাতেই বুঁদ হয়ে গেলাম তার ম্যাজিকে। মিউজিক আর ছবি মিলেমিশে নিজে থেকেই একটা গল্প গড়ে উঠতে লাগল। আর সেই গল্পের পিছু ধাওয়া করতে করতে আমার মনে জাগতে লাগল ঠিক সেই প্রথমবার সান্দাকফুতে ট্রেক করার উল্লাস। কারণ, যত নতুন নতুন শট জুড়ছি, তত নতুনভাবে রূপ খুলছে ভিডিয়োটার।

অবশেষে সেই উইকএন্ডে, আমরা চার মূর্তি সমবেত হলাম আমার ছোট্ট ফ্ল্যাটখানায়। অতিথিসৎকারের যাবতীয় আয়োজন রাজু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। ওর ইচ্ছে, আমাদের মাংস রেঁধে খাওয়াবে। তাই, স্টোভে কেরোসিন আছে কি না দেখে নিয়ে সে তড়িৎ গতিতে বাজারে ছুটল জোগাড়যন্তর করতে। কী জানি বাবা, কেমন লাগবে ওদের ভিডিয়োটা দেখতে। আমায় একেবারে আনাড়ি ভাববে না তো?

যা থাকে কপালে, ভেবে আমি কিবোর্ডে স্পেস বার প্রেস করলাম। গান বেজে উঠল এবং চলতে শুরু করল ভিডিয়ো। পরবর্তী তিন মিনিট ধরে প্রায় নিঃশ্বাস আটকে আমি অপেক্ষা করছি। এমনকি সুরজিৎ বা রাজা, কারও মুখের দিকে তাকাতে অবধি পারছি না। কী জানি বাবা, যদি নেগেটিভ কোনও রিঅ্যাকশন দেখি!

গান শেষ হল একসময়। রাজা একদম চুপচাপ। যেন ভাবছে, কী বলা যায়। বা, মনে যা আসছে তা বলব কি বলব না ধরনের কোনও দ্বিধায় ভুগছে। মানে, লক্ষণ মোটে ভাল নয়। এদিকে একটু গলাখাঁকারি দিয়ে মুখ খুলল সুরজিৎ। বলল, 'সত্যি কথাটা বলি?' আমি ম্লান মুখে ঘাড় নাড়লাম। কারণ ততক্ষণে ধরেই নিয়েছি যে, আমি ধেড়িয়েছি! কিন্তু সুরজিতের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। সে একগাল হেসে বলল, 'আমার তিড়িং বিড়িং করে লাফাতে ইচ্ছে হচ্ছে আনন্দে!'

আহা! শুনে সে কী আনন্দ আমার। একেবারে পরীক্ষায় পাশ করার আনন্দ। যাক, এবার থেকে লোককে বলা যাবে যে, আমি এডিটিংটাও করতে পারি।

তিড়িং বিড়িং এবং পিড়িং পিড়িংময় উল্লাসের বন্যা বয়ে গেল অতঃপর। রাতভর সে দিন গিটার বাজিয়ে একের পর এক গান গেয়ে চলল সুরজিৎ, যার শুরুটা 'বারান্দায় রোদ্দুর' দিয়ে। এবং তারপরে মজার প্রেমের গানের সেই লাইনগুলো... 'কইন্যা আমার হৃৎপিণ্ড... তিড়িং বিড়িং করে...' এত সবকিছুর মধ্যে একজনই শুধু রান্নাঘরে আটকে। আমাদের শ্রীমান রাজু! ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে সে কড়াইয়ের মাংস নাড়ছে তো নাড়ছেই। আর মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে বলছে, 'শালা, পাঁঠা বলে কি ডাইনোসরের মাংস দিয়ে দিল নাকি? তিন ঘণ্টা ধরে ফুটছে, তবু পাথরের মতো শক্ত!'

অভিজিৎ সরকার

(ক্রমশ)

গরিবের 'ইউনিফর্ম' সাজু

গরিব বাবা-মায়ের পক্ষে সাজুর স্কুল ইউনিফর্ম কিনে দেওয়া ছিল সাধ্যের অতীত। ইউনিফর্ম পরে না যাওয়ায় স্কুলে রোজ বকুনি খেতে লাগল সাজু। বিরক্ত হয়ে স্কুলছুট হল সে। বইয়ের পাতা নয়, সাজু জীবিকার সন্ধান পেল ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জীবন থেকেই। কিন্তু কেবল রোজগার করলেই শান্তি হবে? বস্ত্রহীনদের গায়ে শীতে, উৎসবে কিংবা বছরের যে কোনও সময়ে পোশাক চাপিয়ে দেওয়ার পর, হোক না তা পুরানো, তাদের চোখে যে অপার্থিব আনন্দের সন্ধান পেত সাজু, সেটা বোধহয় নেশা হয়ে দাঁড়াল। দেখতে দেখতে সেই সাজু তালুকদারের আরেক নাম আজ গরিবের ইউনিফর্ম।

সাজুর জন্ম হয়েছিল গরিব ঘরে। পাঁচ ভাইবোন আর বাবা-মা মিলে বড় সংসারে সকলের বড় সন্তানটি সবসময়ই দায়দায়িত্বের মধ্যে বেড়ে ওঠা। সাজুও তার ব্যতিক্রম নয়। বীরপাড়া স্কুলের প্রাথমিকের পাঠ শেষ করে ক্লাস ফাইভে হাই স্কুলে পা রাখল যখন, তখন স্কুলের একটু বেশিই অনুশাসনে বাঁধা পড়তে হল ওকে। বিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী ইউনিফর্ম পরতে বাধ্য করা হত ছাত্রছাত্রীদের, সেই সঙ্গে পড়াশোনার ব্যাপারেও কড়াকড়ি। গরিব সাজুর বাবা-মায়ের পক্ষে ইউনিফর্ম কিনে দেওয়া সাধ্যের অতীত। স্কুলে বকুনি খেতে লাগল সাজু। বিরক্ত হয়ে স্কুলছুট হল সে। সরস্বতী ঠাকুরের পায়ে শেষবারের মতো বইখাতা ছুঁইয়ে পুরোপুরি উঠে গেল লেখাপড়ার সরঞ্জাম।

বাড়িতে মা বেশির ভাগ সময়ই অসুস্থ থাকেন। ফলে রান্নাবান্নাও শিখে গেল ওই বয়সেই। ষোলো পেরতে না পেরতেই উপার্জনের চিন্তা। বড় ভাই, বাবার পরেই তার দায়িত্ব, আরও চারটে ভাইবোন রয়েছে পরে। কন্ট্রাক্ট নিয়ে কাজ করতে শুরু করল সাজু। নদী থেকে পাথর-বালি তোলার কাজ। বড় বড় ট্রাক আসত নদীর বেডে। সেই ড্রাইভারদের ধরে গাড়ি চালানোটাও আয়ত্ত করে ফেলল কিছুদিনের মধ্যেই। দিন সবসময় একরকম যায় না। নদীর কন্ট্রাক্টের কাজটা আর করা গেল না। তখন নিজেই

একটা বড়সড়ো গাড়ি কিনে নিয়ে শুরু করল ভাড়া খাটানোর কাজ। ভাড়া নিয়ে দূরদূরান্তে চলে যেতে লাগল। দিল্লি-বম্বের মতো দূরত্বেও তার কোনও আপত্তি নেই। এটিই হয়ে গেল তার মূল পেশা। এখন তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ। বীরপাড়ার তিন কিলোমিটার আগে ডিমডিমাতে রয়েছে তার ছোট্ট একটা সংসার। সেখানে মা তো আছেনই, আছে স্ত্রী ও দুই ছেলে। বড় ছেলে কলেজে পড়ে আর ছোটটি ক্লাস সেভেনে।

এতক্ষণ যে সাজুর কথা বললাম, তার কাহিনির মধ্যে কোনও নতুনত্ব নেই। অত্যন্ত সাধারণ মানের স্বাভাবিক একটি জীবনযাপনের চালচিত্র। কিন্তু এই একই ব্যক্তি তাঁর নিজের মানবজীবনের উল্লেখযোগ্য চিহ্ন রেখে চলেছেন প্রতিনিয়ত, এই ডুয়ার্সের মাটির উপর। নীরবে, একান্তে। সে কথা জানাতেই এই ভূমিকা। কনট্রাক্টের কাজ করার সময় থেকে কিংবা তারও আগে থেকেই (সময়টা মনে করতে পারলেন না) এর-ওর-তার কাছ থেকে জামাকাপড় চেয়েচিন্তে পরনের কাপড়টুকু যাদের নেই, তেমন মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেন সাজু। কখনও প্রকাশ্যে, কখনও বা লুকিয়ে লুকিয়ে। লুকিয়ে না দিলে আরও অনেক না খেতে পাওয়া, না পরতে পারা মানুষ আছে, তারা যদি চেপে ধরে! এত মানুষকে দেওয়ার মতো কিছুই তো নেই ওঁর কাছে। শুধু ইচ্ছেটুকু আছে। ওটাই মূলধন। আর আছে একটা বাইক। কিন্তু অবধারিত ঘটনাক্রমে ক্রমশই বেড়ে উঠতে লাগল চাহিদা। তাহলে তো সাপ্লাই চাই। সাজু

শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাবের তরফ থেকে সম্প্রতি জলপাইগুড়িতে বেশ কিছু অব্যবহৃত জামাকাপড় তুলে দেওয়া হল সাজু তালুকদারের হাতে। তাঁর হাতে তুলে দেওয়া মানে সত্যি সত্যিই প্রয়োজনের মানুষগুলোর কাছেই আমরা পরোক্ষে বাড়িয়ে দিলাম সাহায্যের হাত। তৃপ্তি এখানেই।

পড়ে গেল অলিখিত দায়বদ্ধতায়। শুরু হল কাপড় জোগাড়ের পালা। এ গল্প বলতে বলতে বারবার বলছিলেন, জলপাইগুড়ির মানুষ আমাকে বিরাট আকারে সাহায্য করেছেন। জলপাইগুড়িতে চলে আসতেন বাইকে, পরবর্তীতে গাড়ি নিয়ে। বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে অব্যবহৃত পুরানো বস্ত্র সংগ্রহ করে নিয়ে চলে যেতেন নিজের জায়গায়। সেসব বস্ত্র বিলিয়ে দিতেন গরিব-দুঃখী-দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে। আজও এই একই কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করে চলেছেন সাজু। বিশ্বস্ত ছেলেদের সহযোগিতায় নিজস্ব একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করেছেন এমনভাবে যে, প্রকৃত প্রয়োজনের খবর যেমন পান, তেমনই ওঁর অনুপস্থিতিতেও ঠিকঠাক বস্ত্র পৌঁছে যায় সঠিক স্থানে, সঠিক মানুষের কাছে।

ডুয়ার্সের কঠিন কনকনে ঠান্ডায় চারদিক যখন সাদা হিমের চাদরে মোড়া, তখন একটি কালো অন্ধকার রাতে ফুটপাথের উপর একটি বাচ্চাকে শুয়ে থাকতে দেখেন সাজু। বাচ্চাটি জাপটে জড়িয়ে শুয়ে আছে একটি পথ-কুকুরকে। দু'জনেরই কোনও ঘরদোরের বালাই নেই, শীতবস্ত্র তো দূরের কথা। সাজু জিজ্ঞেস করেছিলেন, এখানে এভাবে শুয়ে আছিস কেন? বাচ্চাটি উত্তর দিয়েছিল, কুকুরকে জড়ালে নাকি ওর একটু আরাম লাগে।

ইউনিফর্ম পরার অভাবে তাঁর পড়াশোনা হয়নি— এ ঘটনা তাঁকে জীবন চেনাতে সাহায্য করেছে। কত মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে মেলাতে সাহায্য করেছে। অনুভব করতে শিখিয়েছে পরনের বস্ত্রখণ্ডটির মূল্যও বেঁচে থাকার দ্বিতীয় শর্ত।

ডুয়ার্সের কঠিন কনকনে ঠান্ডায় চারদিক যখন সাদা হিমের চাদরে মোড়া, তখন একটি কালো অন্ধকার রাতে ফুটপাথের উপর একটি বাচ্চাকে শুয়ে থাকতে দেখেন সাজু। বাচ্চাটি জাপটে জড়িয়ে শুয়ে আছে একটি পথ-কুকুরকে। দু'জনেরই কোনও ঘরদোরের বালাই নেই, শীতবস্ত্র তো দূরের কথা। সাজু জিজ্ঞেস করেছিলেন, এখানে এভাবে শুয়ে আছিস কেন? বাচ্চাটি উত্তর দিয়েছিল, কুকুরকে জড়ালে নাকি ওর একটু আরাম লাগে। আসলে কুকুরটির লোমের ওম এই শীতে ওর শরীরকেও উত্তাপ দেয়। কী বীভৎস মানুষের বাঁচন প্রণালী।

সাজুর অশ্রু সে দিন পথ হারিয়েছিল। চোখের বদলে হৃদয় বেয়ে গড়িয়ে পড়েছিল। ভাবনা শুরু করল সে রাত থেকেই, ব্লাড ব্যাঙ্ক যদি থাকে, ফুড ব্যাঙ্ক যদি থাকে, তাহলে ক্লথ ব্যাঙ্ক কেন থাকবে না? বড় আকারে বস্ত্রসংগ্রহের প্রেরণা এভাবেই। একজন-দু'জন নয়, আজকের তারিখে সাজু তালুকদার বুক চাপড়ে বলতে পারেন, একসঙ্গে দশ হাজার মানুষকে বস্ত্র দেওয়ার মতো বস্ত্র এই মুহূর্তে জমানো আছে আমার ব্যাঙ্কে। ব্যাঙ্কের নাম রেখেছেন, BIR BIRSA MUNDA CLOTH BANK (USED). হাসতে হাসতে বললেন, মজার ব্যাপার দেখুন, আমার এই কাজের জন্য আমার এক নয়া পয়সা কারও কাছে চাইতে হল না, অথচ কত মানুষের কত উপকারে লাগল। আমি তো ভাড়া নিয়ে এদিক-ওদিক যাই-ই। সেই পথেই এসব কাজ হয়ে যায়।

সাজু তালুকদারের গল্প যদি এখানেই শেষ হত তাহলে কিছু বলার ছিল না। কারণ সাজু ডুয়ার্সে একটি নাম। মহৎ হব বলে কেউ হয় না, অন্তরের সদিচ্ছা তাকে টেনে নিয়ে যায়, মহান পথের সন্ধান দেখায়, তখন ঈশ্বরের আশীর্বাদ ঝরে পড়ে তার উপর। তার হাত দিয়ে হতে থাকে একটার পর একটা ভাল কাজ।

গাড়ির ভাড়া নিয়ে অথবা নিজের প্রয়োজনে প্রায়ই হাই রোড ধরে যাতায়াত করতে হয় সাজুকে। দেখেন, একটি বাসের যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে এক বৃদ্ধ, দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে তাঁর মুখ আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দাঁড়ানো বা বসা নয়, ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে মাটিতে হাঁটু ঘষে ঘষে চলেন তিনি। এই বৃদ্ধকেই কখনও বা দেখতে পান, বড় রাস্তা ধরে ঠা ঠা গরমে হাঁটু ছেঁচড়ে কোথায় যেন চলেছেন। কৌতূহল দমন করতে না পেরে একদিন গাড়ি থামিয়ে কথা বললেন ওই বৃদ্ধের সঙ্গে।

—কোথায় থাকেন আপনি?

—এখানেই।

—খান কোথায়?

—ওইখানে একটা স্কুলে মিডডে মিল থেকে দেয়।

প্রথম দিন কথা এগল না। দ্বিতীয় দিন আর-একটু। তৃতীয় দিন আরও। ভরসা আর বিশ্বাস একজনকে অপরজনের কাছাকাছি এনে দিতে লাগল। জানা গেল, এঁর ঘর-বাড়ি-আত্মীয়-পরিজন কোথাও কিছু নেই। আর এক ধাপ এগনোর সাহস পেলেন সাজু। কোনও এক অ্যাক্সিডেন্টের পর দু'-তিন দিন জ্ঞান হারিয়ে এই বৃদ্ধ পড়ে ছিলেন এক ধানের গোলার আড়ালে, অচৈতন্য অবস্থায়। জ্ঞান ফিরতেই গোঙানির শব্দে জানাজানি হয়। বৃদ্ধের অনুরোধেই তাঁকে পৌঁছে দেওয়া হয় হাই রোডের উপর। দু'বছর ধরে এই দিনলিপি চলছে, প্রায় জনহীন এই যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে থাকা আর কাছাকাছি একটি স্কুলের মিডডে মিলের আহার। সাজু অধিকার আদায় করল কয়েকদিনের মধ্যে। নাপিত নিয়ে এসে কাটা হল তাঁর চুল-দাড়ির অরণ্য। পায়ে ঘা। বিনে পয়সায় এক ডাক্তারবাবু সাজুর অনুরোধে তাঁর চিকিৎসা করলেন। অ্যান্টিবায়োটিক দিলেন আর সেই সঙ্গে ড্রেসিং। খাওয়ার ওষুধ নিয়ে তেমন ভাবনা নেই। কিন্তু ড্রেসিং? দু'দিন পরপর সাজু নিজে গিয়ে তাঁর পায়ের ঘায়ের ড্রেসিং করতে লাগলেন। ঘা শুকাল। এবার? এভাবেই কি এখানে ফেলে রাখা যায়? সাজুর খুব ইচ্ছে করছে, বুড়োটাকে নিজের কাছে নিয়ে আসে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বলে গিয়েছেন, 'মানুষের উপকার করিবার অধিকার থাকা চাই।' সাজু জানেন না, তাঁর অধিকারের সীমাবদ্ধতা কোথায়? জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধকে, 'এখন তুমি কোথায় যাবা? এইভাবে তো আর থাকা যায় না।' বুড়ো সঙ্গে সঙ্গে বলে বসলেন, 'তোর কাছে যাব।' হাতে যেন চাঁদ পেলেন সাজু। বললেন, 'চলো আমার বাড়ি। আমার সঙ্গেই থাকবা।' স্ত্রীকে বুঝিয়ে বলে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন বুধুয়াকে। নিজের থাকার জায়গার পাশেই একটি অসম্পূর্ণ ঘরে থাকার ব্যবস্থা হল পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধ বুধুয়ার। পঞ্চায়েত, থানা, আরও প্রশাসনিক স্তরে জানানোর কাজ করে ওঁর থাকার ব্যবস্থা পাকা করে নিয়েছেন সাজু। বছর ঘুরতে চলল, অভিভাবকের অধিকার আদায় করেছেন বুধুয়াও।

হঠাৎ একটা ফোন। সাজু তখন গাড়ি নিয়ে বাইরে। খোকন রায় নামে একজন তোমার কাছে থাকতে চায়। ওরও কোনও কূলে কেউ নেই। সাজু ফোনেই বললেন, 'রাইখে দাও।' বুধুয়ার সঙ্গে স্থান হল খোকনেরও।

মুখে একটা নিষ্পাপ হাসি মাখিয়ে সাজু বললেন, 'আমার অসুবিধার মধ্যে শুধু একটাই হইসে, আগে রত্না চালের ভাত খাইতাম, আর এখন দুইজন সদস্য বাড়ায় রেশনের আতপ চাল খাই। আমার স্ত্রী প্রথমটায় বলেছিল, আতপ চাল আমি খাইতে পারি না। আমি বলেছি, প্রথম প্রথম কষ্ট হবে, তারপর দেখবা, অভ্যাস হয়ে গেসে। ঠিকই তা-ই, এখন আর আমাদের কোনও অসুবিধা নাই।' মাথায় এসে গিয়েছে বৃদ্ধাশ্রমের পরিকল্পনাও। সাহায্যের আবেদন করেছেন বিভিন্নজনের কাছে। অর্ধেক পেয়েওছেন। কাজও চলছে। দেখা যাক, কী হয়। সাজু তালুকদার আমাদের ডুয়ার্সের গর্ব, আমাদের আপনজন।

শ্বেতা সরখেল

আলিপুরদুয়ার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আলিপুরদুয়ার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ। এই লিগে উদয়ন ক্রিকেট অ্যাকাডেমি প্রথম স্থান দখল করে ও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পায়, ডিভিশনাল রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাব রানার্স হয়। উদয়ন অ্যাকাডেমির খেলোয়ারদের হাতে ‘সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ ২০১৬-১৭’-র চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। রানার্স ট্রফি দেওয়া হয় দ্বিতীয় স্থানধিকারী দলের খেলোয়ারদের হাতে। এছাড়া ছিল প্লেয়ার্স অব দ্য টুর্নামেন্ট, টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ উইকেট প্রাপকের ট্রফি। টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারীকে দেওয়া হয় ‘কাজল মেমোরিয়াল ট্রফি’, যেটি পেয়েছেন রেলওয়েজ স্পোর্টস ক্লাবের জয়দীপ নাথ। তিনি ৭টি ম্যাচ খেলে ৩১১ রান করেন, উদয়ন অ্যাকাডেমির অনিন্দ্য ঘোষ ১৬টি উইকেট পেয়ে সর্বোচ্চ উইকেট প্রাপকের ট্রফি পান। ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্টর শিরোপাও তিনি দখল করেন।

জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি সঞ্চয় ঘোষ এই খবর জানিয়ে বলেন, এছাড়া একটি ডিভিশন ক্রিকেট লিগ হয় যাতে ৩৫টি ম্যাচ হয় এবং আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে বিভিন্ন দল অংশগ্রহণ করে। এখানে আলিপুরদুয়ার টাউন ক্লাব চ্যাম্পিয়ন ও রেনবো ক্রিকেট ক্লাব রানার্স আপ হয়। এই দুটি টিম আগামী বছর সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে অংশগ্রহণ করবে।

নি.প্র.

আপনার এলাকার যে কোনও টুর্নামেন্ট বা খেলোয়াড়ের খবর জানাতে পারেন, আমরা পছন্দ হলে তা এই পাতায় ছাপতে পারি। লেখা ও ছবি হোয়াটস্অ্যাপ করুন ৯৮৩১০৭৬৪৬৪ নম্বরে, সঙ্গে দেবেন আপনার নাম ও ফোন নম্বর।

কোচবিহার আন্তঃক্লাব সাব জুনিয়ার ফুটবল লিগ

কোচবিহার রাজবাড়ি সংলগ্ন স্টেডিয়ামে শুরু হল আন্তঃক্লাব সাব জুনিয়ার ফুটবল লিগ। লিগের প্রথম দিনের খেলা হয় স্পিরিচুয়াল স্পোর্টস অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব এবং নব জাগ্রত সংঘের মধ্যে। কোচবিহার জেলা ক্রীড়াসংস্থা পরিচালিত এই ফুটবল লিগের উদ্বোধন করেন কোচবিহার বার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল আহমেদ। জেলা ক্রীড়াসংস্থা পরিচালিত সিনিয়র এবং জুনিয়ার ফুটবল লিগে অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলোর হাতে সংস্থার পক্ষ থেকে ফুটবল তুলে দেন সংস্থার সচিব বিষ্ণুব্রত বর্মণ ও অন্যান্য ক্লাবকর্তা। বর্তমানে জেলার খেলাধূলার উন্নয়নে কোচবিহার জেলা ক্রীড়াসংস্থা খুব ভাল কাজ করছে বলে এদিন জানান জলিলবাবু। প্রথম দিনের খেলায় স্পিরিচুয়াল স্পোর্টস অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব ২-১ গোলে নব জাগ্রত সংঘকে পরাজিত করে। **নি.প্র.**

এমজেএন ক্লাবে টেবিল টেনিস টুর্নামেন্ট

কোচবিহার এমজেএন ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় গত ২৬-২৭ অগস্ট অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আমন্ত্রণমূলক টেবিল টেনিস টুর্নামেন্ট। ক্লাবের নিজস্ব ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ক্লাব প্রেসিডেন্ট তথা জেলাশাসক কৌশিক সাহা। দু’দিন ব্যাপী এই টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছিলেন শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের মোট ৭০ জন ছেলেমেয়ে। ক্লাব সম্পাদক জয়ন্ত সিং জানালেন, এই টুর্নামেন্ট ঘিরে দুটো দিন ক্লাব সদস্যদের মধ্যে উদ্দীপনা ছিল প্রবল। প্রতিযোগিরা অংশ নিতে পেরে সবাই খুশি। জয়ন্তবাবুর মতে আজকের দিনে যেখানে খেলাধূলার উৎসাহ ক্রমশ কমে আসছে, সেখানে এই ধরনের প্রতিযোগিতা তরুণ ছেলেমেয়েদের মধ্যে উৎসাহ যোগাবে নিঃসন্দেহে। **নি.প্র.**

মালবাজার শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাবের ৭১তম স্বাধীনতা দিবস পালন

শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাব (মালবাজার) গত ১৯ অগস্ট 'কিশলয় স্কুল'-এ খুব সুন্দর একটি ঘরোয়া আড্ডার আয়োজন করেছিল। এবারের বিষয় ছিল ৭১তম স্বাধীনতা দিবস। প্রথমে অনুষ্ঠান শুরু হল শ্রীমতী মীণাক্ষী ঘোষের কণ্ঠে কবি অজিত দাসের 'ভারতবর্ষ' কবিতা দিয়ে। এরপর শ্রীমতী ইন্দিরা বিশ্বাস ও স্বাতী মজুমদারের দ্বৈত দেশাত্ববোধক গান পরিবেশিত হল। স্বাধীনতা দিবস নিয়ে বললেন শ্রীমতী বনানী সেনগুপ্ত, শ্রীমতী মধুছন্দা সাহা ও শ্রীমতী লিপি দে সরকার। এরপর গান শোনালেন শ্রীমতী মমতা বসু। নৃত্য পরিবেশন করলেন শ্রীমতী কৃষ্ণা সেন, শ্রীমতী উমা দাত্ত স্বরচিত কবিতা পাঠ করলেন। নাগরাকাটার শ্রীমতী কেয়া ব্যানার্জী বক্তব্য ও সংগীত পরিবেশন করলেন। শ্রীমতী কেয়া ব্যানার্জী ও শ্রীমতী শেলী গুপ্তের অসাধারণ সংগীত আড্ডার পরিবেশকে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছিল। কবিতা পাঠ করে শোনালেন শ্রীমতী ইন্দিরা বিশ্বাস। অনুষ্ঠান বেশ জমজমাট

Hotel Yubraj & Restaurant Monarch (Air Conditioned)

Room	Single	Double
Super Deluxe (Non AC)	Rs 650	900
Deluxe AC	Rs 990	1200
Super Deluxe AC	Rs 1100	1300
VIP Deluxe AC	Rs 2000	2000
Suite	Rs 3000	3000
VIP Suite	Rs 3500	3500
Extra Occupancy on (Non AC)	Rs 100	---
Extra Occupancy on (AC)	Rs 200	---

N.B. Tax as per applicable

Charu Arcade, B. S. Road, Cooch Behar, (W.B.)
Tel: (03582) 227885 / 231710
email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubraj.com

শ্রীমতী ডুয়ার্স
ডুয়ার্সের ডিশ

ডিম চাট

উপকরণ: ২টো ডিম, ১টা পিঁয়াজ, অর্ধেক শসা, ১টা টম্যাটো, ১টা কাঁচা লঙ্কা। পরিমাণ মতো টম্যাটো সস্, অল্প গোল মরিচের গুঁড়ো, একটু বিটনুন, পরিমাণ মতো ঝুরি ভাজা (অবশ্যই হলদিরামের ঝুরি ভাজা)।

স্বপ্না পাল

প্রণালী: প্রথমে ডিম দুটো ফেটিয়ে পিঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি দিয়ে গোল আকারে ওমলেট তৈরি করতে হবে। একটু বেশি তেল দিয়ে ভাজতে হবে। তারপর একটা বড় প্লেটে রেখে, তাতে শসা কুচি, পিঁয়াজ কুচি, টম্যাটো কুচি দিয়ে সাজিয়ে তাতে বিটনুন টম্যাটো সস্ বা তেঁতুলের পালত তার উপর ঝুরি ভাজা দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন আপনার প্রিয় জনকে।

হয়ে উঠেছিল, এরই মাঝে বন্যা দুর্গত মানুষদের পাশে কীভাবে দাঁড়ানো যায় শ্রীমতীরা সেই নিয়ে আলোচনা করলেন। জমা করা হল পুরনো জামাকাপড়। বীরসা মুন্ডা ক্লথ ব্যাঙ্কে (বীরপারা) আগামী ৯ সেপ্টেম্বর এই জামাকাপড় জমা দিতে যাবেন শ্রীমতীরা। আড্ডা, গল্প, গান হাসাহাসির মাঝে আলোচনায় উঠে আসছিল সেই সব অসহায় মানুষদের কথা যারা আশ্রয়হীন। সবাই অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন আমরা আমাদের জীবনের থেকে একটু সময় বের করে সমাজের জন্য কিছু করবেন। 'শ্রীমতী ডুয়ার্স' ক্লাব মালবাজার শাখার এখন সদস্য সংখ্যা ৩০। সব শ্রীমতীদের এক কথা এই ক্লাব আমাদের জীবনে দরকার ছিল। সবাই এগিয়ে এসেছেন আহ্বায়ক শ্রীমতী মীণাক্ষী ঘোষের পাশে। দৈনন্দিন একঘেয়ে জীবন থেকে একটু মুক্তি, একটু অন্যরকম কাজ মানুষকে অনেক শান্তি দিতে পারে। এক বাক্যে সবাই স্বীকার করলেন। আলোচনা, আড্ডা, অনুষ্ঠান জমজমাট হয়ে উঠেছিল। আবার ৯ সেপ্টেম্বর দেখা হবে। আমরা শ্রীমতীরা চাইলে অনেক কিছুই করতে পারি। এই ভাবনা নিয়ে আগামী দিনের পথ চলা। অনুষ্ঠান শেষ হল 'জন-গণ-মন' জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে।

মীণাক্ষী ঘোষ

কেরালা টুর ২০১৭

জার্নি ডেট: ০৬/১০ ও ২৭/১২/২০১৭
(১৫ দিনের টুর, এনজেপি থেকে এনজেপি)

২১,৬০০ টাকা জনপ্রতি (প্রাপ্তবয়স্ক)
১৮,৮০০ টাকা জনপ্রতি (তৃতীয় ব্যক্তি)
১৬,৮০০ টাকা (৫-১১ বছর বয়সী)
৯,৬০০ টাকা (২-৪ বছর বয়সী)

টুর প্যাকেজে থাকছে

১) আপ ও ডাউন স্লিপার ক্লাসের ভাড়া
২) ডিলাক্স বাস বা টেম্পো ট্রাভেলার
৩) ফ্যামিলি প্রতি রুম
৪) সব খাবার (ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ইভনিং টি, ডিনার) **(ট্রেনের খাবার বাদে)**

প্যাকেজ খরচের অন্তর্গত
খাওয়া, থাকা, সাইট সিইং

দ্রষ্টব্য: প্রতি প্যাকেজে অন্তত ৮ জন হতে হবে

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

HOLiDAYAAR

Siliguri Office: Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri 734001 Ph: 0353-2527028, +91 9002772928

Cooch-Behar Office:
Ph: +91 9434042969

Jalpaiguri Office: Addaghar, Mukta Bhaban, Merchant Road Jalpaiguri 735101
Ph: 03561-222117, 9434442866

মাদক নেশা থেকে মুক্তি পাওয়ার তীব্র আর্তি থেকেই সৃষ্টি ‘সঞ্জীবনী’

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

সঞ্জীবনী নেশামুক্তি ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, নিচে আজকের দীপংকর

গোটা বিশ্বে প্রতি সেকেন্ডে ২৭ জন মাদকাসক্তর মৃত্যু ঘটছে। একজন সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের জীবন এক লহমায় তছনছ করে দেয় মাদকের নেশা। এই নেশা থেকে সহজেই অনেকে আর বেরিয়ে আসতে পারে না। বিপন্ন হয়ে পড়ে তার সাংসারিক জীবনও। কিন্তু কথায় আছে, চেষ্টা করলেই মানুষ সবকিছু করতে পারে। চাইলে নেশাগ্রস্ত জীবন থেকেও বেরিয়ে আসা যায় সঠিক কাউন্সেলিং, চিকিৎসার সাহায্যে, অবশ্যই সদিচ্ছা থাকলে। যেভাবে এক ভয়ংকর মাদকাসক্ত জীবন থেকে আজ পরিত্রাণ পেয়েছেন জলপাইগুড়ির রায়কতপাড়ার বাসিন্দা দীপংকর সেন।

জলপাইগুড়ি ফণীন্দ্র দেব স্কুল থেকে মাধ্যমিক ও জেলা স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে কলা বিভাগ নিয়ে শহরের আনন্দচন্দ্র কলেজ থেকে স্নাতক হন দীপংকর। এরপর নেপালের পোখরাতে যান এমবিএ করতে। সেখানে পড়তে পড়তেই ক্যাম্পাসিং-এর মাধ্যমে একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কাজে যোগ দেন তিনি। এমবিএ-র পাঠ মাঝপথেই ছেড়ে দেন। মোটা অঙ্কের বেতনের ওই চাকরি করতে পোখরাতেই থেকে যান দীপংকর। দীপংকরের পরিবার যথেষ্ট সচ্ছল। তাই বেতনের এক টাকাও বাড়িতে পাঠানোর কোনও প্রয়োজন পড়ত না। ফলে অত টাকা বেতন পেয়ে দীপংকরের জীবন আমূল বদলে যেতে থাকে। ক্রমশই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে জীবনযাত্রা। সিগারেট-মদ থেকে ক্রমেই ড্রাগের নেশা— কোনও কিছুই বাদ গেল না জীবনে। মাদকাসক্ত জীবন এমন ভয়াবহ হয়ে উঠল যে, চুরি পর্যন্ত করতে হয়েছিল তাঁকে! এরপর বাড়িতে এলে ছেলেকে দেখে সন্দেহ হয় মায়ের। মা তাঁকে তাঁর জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানতে চাইলে সব কথা খুলে বলেন দীপংকর। তিনি মাকে বলেন, নেশার জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনযাত্রা করতে চান, কিন্তু

তা কোনওভাবেই সম্ভব হচ্ছে না। একদিন মা ছেলেকে নিয়ে সোজা চলে যান কলকাতায়। সেখানে এক নেশামুক্তি ও পুনর্বাসনকেন্দ্রে ছেলেকে ভরতি করান। সেখানে সাত মাস থেকে চিকিৎসা ও কাউন্সেলিং-এর মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন দীপংকর। নতুন জীবন ফিরে পান।

নতুন জীবন পেয়ে তিনি উপলব্ধি করেন, নেশাগ্রস্ত জীবন কখনওই মানুষকে স্বাভাবিক ছন্দে বাঁচতে দেয় না। তাই সমাজ থেকে যেভাবেই হোক এই অভিশাপকে দূর করতেই হবে। আর সেই দায়িত্ব তুলে নিলেন নিজের কাঁধেই। অনেকের কাছেই গিয়েছেন নিজের জেলায় মাদকাসক্ত মানুষদের নেশামুক্ত করার জন্য একটি পুনর্বাসনকেন্দ্র খোলার লক্ষ্যে, কিন্তু কেউই তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি। শুধুমাত্র বাবা-মায়ের অনুপ্রেরণায় শহরের সেবাগ্রাম এলাকায় সঞ্জীবনী ফাউন্ডেশন নামে একটি নেশামুক্তি ও পুনর্বাসনকেন্দ্র চালু করেন দীপংকর। ২০১৫ সালের ১৫ অক্টোবর এই কেন্দ্রের পথ চলা শুরু। সম্প্রতি দীপংকরের এমন মহৎ কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বন্ধু রাজ দে। রাজের জীবন কাহিনিও ছিল দীপংকরের মতোই। তিনিও এতটাই মাদকাসক্ত ছিলেন, একটা সময়ে প্রায় পাঁচ বছর একটানা তাঁকে গৃহবন্দি রেখেছেন পরিবারের সদস্যরা। এমনকি একবার পথদুর্ঘটনায় প্রাণও যেতে বসেছিল তাঁর। সেসব ভয়াবহ অতীতকে মনে করলে আজও শিউরে ওঠেন দুই বন্ধু।

বর্তমানে তাঁদের হাতে তৈরি এই পুনর্বাসনকেন্দ্রে ১০ জন মাদকাসক্ত আবাসিক হিসেবে থেকে নতুন জীবন ফিরে পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এদের মধ্যে শহরের তিনটি নামকরা বিদ্যালয়ের তিনজন ছাত্রও রয়েছে। অত্যন্ত যত্নে এখানে তাদের চিকিৎসা ও কাউন্সেলিং-এর ব্যবস্থা রয়েছে। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির বিশিষ্ট চিকিৎসকরা এদের নিয়মিত চিকিৎসা করে থাকেন। ইতিমধ্যে এখান থেকে ৪২ জন বিভিন্ন বয়সি মাদকাসক্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে। পুনর্বাসনকেন্দ্রে একঘেয়ে জীবন থেকে রেহাই দিতে টেলিভিশন এবং বিভিন্ন ইনডোর গেমসের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সঞ্জীবনী ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা দীপংকর সেন বলেন, নারকোটিকস অ্যানোনিমাস পদ্ধতিতে চিকিৎসা করানো হয় এখানে। তাঁর মতে, নেশাসক্ত ব্যক্তি অপরাধী নয়, অসুস্থ মাত্র। উপযুক্ত চিকিৎসা ও কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমেই এর চিকিৎসা সম্ভব। উপযুক্ত পরিকাঠামো ও পরিবেশে এখানে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মাদকাসক্ত রোগীদের সুস্থ করে তোলা হয়। এ জন্য রোগীর পরিবারের কাছ থেকে কখনওই নির্দিষ্টভাবে কোনও অর্থের দাবি করা হয় না। এখান থেকে সুস্থ হয়ে যখন কোনও মানুষ নতুন জীবনে ফিরে যায়, সেই আনন্দের চেয়ে বড় আনন্দ আর কিছুই হয় না। একই মত দীপংকরের বন্ধু রাজেরও।

শুভ্রজিৎ পোদ্দার

দেশি না ব্রয়লার?

স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে ড্রেস ছাড়ার আগেই অর্কর প্রথম প্রশ্ন— মা, আজকের মেনু কী? এটা অবশ্য একদিন নয়, শ্রীতমাকে নিয়ম করে প্রতিদিনই এই প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। ছেলের নিরামিষ শাকসবজি একেবারেই না-পসন্দ। মাছের মধ্যে শুধু ইলিশ-চিংড়ি, একমাত্র চিকেনের নাম শুনলে হাসি ফুটে ওঠে মুখে। তা-ই বলে প্রতিদিন চিকেন? শ্রীতমা অবশ্য একা নয়, বর্তমান যুগে প্রায় প্রতিটি ঘরে এই একই চিত্র। সমস্যা একটাই, তা হল এই প্রজন্মের বাচ্চাদের চিকেনপ্রীতি। এদিকে চিকেন নিয়ে মাঝেমধ্যেই এত্ত কিছু শোনা যায়, যে তাতে বাবা-মায়ের মাথা প্রায় খারাপ হওয়ার জোগাড়। গড়পড়তা মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরে রবিবার মাংস খাওয়ার দিন। আগে তা কচি পাঁঠাতে সীমাবদ্ধ থাকলেও এখন তার দাম সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাওয়ায় বেশির ভাগ বাড়িতেই জায়গা পাকা করে নিয়েছে মুরগির মাংস। বিশেষ করে ব্রয়লার। দেশি চিকেনের স্বাদ নিঃসন্দেহে বেশি হলেও কাটতি কিন্তু অন্যটারই বেশি। যদিও এই দুই ধরনের মধ্যে দেশি ভাল না ব্রয়লার ভাল তা-ই নিয়ে চিন্তার ভাঁজ দেখা দেয় মাঝেমধ্যেই।

ব্রয়লার ও দেশির দ্বন্দ্ব কাটাতে এ বিষয়ে জানতে চাইলাম শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বিনায়ক রায়ের কাছে। তিনি ভালর তালিকায় রাখলেন দেশি চিকেনকেই। বক্তব্যের সমর্থনে বললেন, ব্রয়লার চিকেনে ফ্যাট আছে পাঁঠার মাংসের সমান। কিন্তু দেশি চিকেনে অত ফ্যাট থাকে না। এ ছাড়াও পোল্ট্রি ফার্মে অনেক সময় মুরগিদের সিপ্রোফ্লক্সেসিন নামে এক ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়, যার ফলে এই মাংস বেশি খেলে শরীরে সিপ্রোফ্লক্সেসিন রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয়ে যায়, যা বাচ্চাদের পক্ষে ক্ষতিকারক। কিন্তু দেশি চিকেনের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনও সমস্যা থাকে না। তাদেরকে আটকে না রেখে ছেড়ে দিয়ে বড় করা হয়। সুতরাং ডাক্তারি দৃষ্টিভঙ্গিতে দেশি চিকেন ব্রয়লারের তুলনায় অনেক বেশি স্বাস্থ্যসম্মত। সাধারণ মানুষের কাছে এই মেসেজটা পৌঁছানো দরকার।

এর অনেকটা ভিন্ন মত পাওয়া গেল অপর একটি আলোচনায়। আপাতদৃষ্টিতে এই দুই ধরনের চিকেনের মধ্যে তেমন কোনও পার্থক্য দেখা না গেলেও, একটু গভীরভাবে দেখলে বেশ কিছু জিনিস নজরে আসবে বলে জানালেন উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক দিলীপ হাজরা। তাঁর মতে, পোল্ট্রি ফার্মে মুরগিদের যে টিকা দেওয়া হয়, তার কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কিন্তু হয় না এই মাংস খেলে। তবে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যাপারটা অন্য। ফার্মে মুরগির বাচ্চাগুলোকে বাইরে থেকে নিয়ে আসা হয়। তাদের সে সময় ইমিউন পাওয়ারও কম থাকে। কোনও রোগ যাতে তাদের আক্রমণ করতে না পারে, তার জন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাদের খাবার অথবা জলের সঙ্গে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। দেখা যায়, অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার ২১ দিনের মধ্যে যদি কোনও মুরগি বাজারজাত না হয়, তবে তার মধ্যে পরবর্তীতে আর ক্ষতিকারক কিছু থাকে না, সেই মাংস খাওয়া শরীরের পক্ষে বিপজ্জনক নয়। সাধারণত ফার্মগুলোতে এটাই করা হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন রিসার্চ অর্গানাইজেশন বিভিন্ন

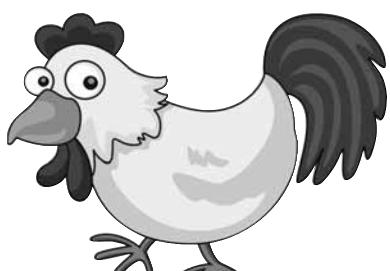

জায়গা থেকে স্যাম্পলিং করে দেখেছে, মাংসে অ্যান্টিবায়োটিকের রেসিডিউ পাওয়া যাচ্ছে। এ-ও নানা কারণে হতে পারে। ফার্ম থেকে ব্রয়লার বেরিয়ে পাইকারি ও খুচরো ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যায়। বার হওয়ার আগে বা পরবর্তীতে যাদের কাছে গেল, সেখানে কোনও রোগের শিকার হতে পারে। সে সময় অ্যান্টিবায়োটিক দিলে তার মাংস খাওয়া অবশ্যই ক্ষতিকারক। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা এসব কিছু বুঝতে পারি না।

আবার আমরা দেখি, দেশি মুরগি বাইরে ঘুরে নিজের পছন্দের বা প্রাকৃতিক খাবার খাচ্ছে, যার জন্য তাদের শরীরে ক্যারোটিন অনেক বেশি থাকছে। কিছু ক্ষেত্রে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডও পাওয়া যায়। অন্য দিকে, ব্রয়লারের ক্ষেত্রে তাদের খাবারের গুণাগুণ ও পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে। খুব দ্রুত মাত্র ৪২ দিনে তারা বাড়ে। সেখানে একটা দেশি মুরগি বাড়তে সময় নেয় ৬ থেকে ৮ মাস। ব্রয়লারের বয়স কম বলে তার মাস্‌ল ফাইবার খুব নরম হয়। ব্রয়লার যত বড় হবে, তত চামড়ার নিচে ফ্যাট জমবে। তাই ব্রয়লার যত ছোট, তার টেস্ট তত ভাল। বডিতে যে ফ্যাট তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড। যাদের কোলেস্টরল আছে, তাদের পক্ষে ক্ষতিকর। একটা দেশি মুরগি অনেক কম ওজনের হয়। এতে লাভটা কম হয়। আবার বয়স বেশি হওয়ায় তার মাস্‌ল ফাইবার শক্ত হয়ে যায়।

বর্তমানে অ্যানিমাল রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট সব ফার্মারকে মুরগির বাচ্চা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রয়োজনীয় ভ্যাক্সিন যাতে হয় তা নজর রাখছে। সে ক্ষেত্রে দেশি বা ব্রয়লারে কোনও পার্থক্য থাকে না। আগেই বলেছি, টিক আমাদের শরীরে কোনও ক্ষতি করতে পারে না। সেভাবে দেখতে গেলে দেশি বা ব্রয়লার কোনওটাই খারাপ নয়। কেবলমাত্র অ্যান্টিবায়োটিকসহ যে ইস্যুগুলো থাকছে, সেগুলোর দিকে নজর দিতে হবে। তবে এখন ব্রয়লার তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানির হাত ধরে। সে ক্ষেত্রে বাজারজাত হওয়ার আগে পর্যন্ত তারা একটা নজরদারির মধ্যেই থাকে।

অতএব আলোচনা থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার যে, ব্রয়লার, যাকে ইন্ডাস্ট্রি বলে এখন তুলে ধরার চেষ্টা চালানো হচ্ছে, তার মাংসে অ্যান্টিবায়োটিক আছে না নেই তা আমাদের পক্ষে বোঝা কোনওমতেই সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন একটা রেগুলেটরি টিমের। যদিও একমাত্র বিদেশের মতো এখানেও মাংস প্যাকেট করা যেত, তখন তাকে রেগুলেট করা সম্ভব হত। কিন্তু তাজা মাংসর ক্ষেত্রে রেগুলেট করা কোনওমতেই সম্ভব নয়।

দিলীপবাবুর মতে, আমাদের কাছে সহজলভ্য হচ্ছে ব্রয়লার। সে ক্ষেত্রে একটু ছোট ব্রয়লার হলে তাতে প্রোটিনের অংশটা বেশি থাকে, যা বাচ্চাদের পক্ষে ভাল। আমরা তো দেশি চিকেন সবসময় পাব না বা কম দামেও পাব না। তাই আমরা ব্রয়লারকে কোনওমতেই না বলতে পারব না। সাধারণত এই মাংস ক্ষতিকর হওয়ার কথা নয়। তবে যদি কেউ অসাধু ব্যবসায়ী হয়, তখন আলাদা কথা।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

নাগরাকাটা ক্যারন চা-বাগান, মহিষ রাজা ও ছলনাময়ী এক নারীর উপাখ্যান

শিউলি ফুলের গন্ধ, সপ্তমীর সকাল, ভোরের আলো গায়ে মেখে কলাবউয়ের স্নান। আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা দিন। তারপরই নবপত্রিকার পুজো দিয়ে শুভসূচনা হবে দুর্গাপুজোর। ময়নাগুড়ি থেকে সলসাবাড়ি, মালবাজার থেকে চিকলিগুলি মেতে উঠবে শারদ উৎসবে। সপ্তমীর সকালের রোদটা তেমন অলৌকিক লাগবে। মনে হবে, নীল আকাশের স্ফটিক পাথর থেকে যেন ঐশী দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ছে ডুয়ার্স জুড়ে। সেই আলোর সঙ্গে মিশে যাচ্ছে সোনার গুঁড়ো। সুরের অনুরণনের মতো তা ছড়িয়ে পড়ছে মনের মধ্যে। জাগিয়ে তুলছে মুঠো মুঠো খুশি। একেই বোধহয় বলে আলোর বেণু। শরতের ভুবন মেতে ওঠে, যখন বেজে ওঠে আলোর বেণু। শারদ প্রাতের পুণ্য মুহূর্তে বেজে ওঠে পুজোর ঢাক। তার শব্দ ছড়িয়ে পড়ে বহু দূর পর্যন্ত। নীল আকাশ, মাঠের সোনারঙা ধান উদ্‌বেল হয়ে ওঠে এক অপ্রাকৃত মূর্ছনায়।

নাগরাকাটা ব্লকের ক্যারন চা-বাগানের আলাদা করে খোঁজ রাখে না কেউ। অথচ

ঠিক শারদীয়া উৎসবের সময় প্রচারের আলো পড়ে জলপাইগুড়ি জেলার এই চা-বাগানে। মিডিয়া আমাদের জানায়, দুর্গাপুজোর দিনগুলোতে এই গ্রামের অনেকের ঘরেই আলো জ্বলে না। গায়ে নতুন জামাকাপড়ও ওঠে না। ক্যারন চা-বাগানের শেষ প্রান্তে কারি লাইনে রয়েছে ৪৫টি অসুর পরিবার। গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দারা বলেন, তাঁরা দুর্গাপুজোয় যোগ দেন না, কারণ তাঁদের পূর্বপুরুষকে দুর্গা নামে বহিরাগত এক সুন্দরী রমণী ছলাকলায় ভুলিয়ে হত্যা করেছিল। শারদীয়া উৎসবের দিনগুলো তাই তাঁদের কাছে অশৌচপালনের দিন।

আমাদের কৌতূহল জেগে ওঠে। খবরের কাগজের প্রতিবেদক তুলে ধরেন আলো-আঁধারির জাফরি কাটা এক চিত্র। ক্যারন চা-বাগানের অসুররা সকলেই ঝুপড়িতে থাকেন। মহিলারা বাগানে চা-পাতা তোলেন। পুরুষরা বেশির ভাগ সময় দিনমজুরের কাজে ভুটান চলে যান। সেখানে দৈনিক তিনশো টাকা মজুরি। কেউ আবার ভুটান থেকে আসা বস্তায় বাঁধা কাঁচা সুপারি গাড়িতে তোলার কাজ করেন। মেটেলি আর মালবাজারের চা-বাগানে আরও কয়েক ঘর অসুর আছেন। ওঁরা নিজেদের মধ্যেই বৈবাহিক সম্পর্ক পাতান।

মহীশূরে যাবার সুযোগ হয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে। এখনও স্পষ্ট মনে আছে, সেখানে চামুণ্ডী পাহাড়ের বিখ্যাত চামুণ্ডী মন্দিরে দেখেছিলাম শক্তিমান মহিষাসুর মূর্তি। গোঁফ ও গালপাট্টা সমেত রাজার মতো দাঁড়িয়ে। এক হাতে খড়্গ, অন্য হাতে সাপ। মহিষাসুরের দুই সেনাপতি চণ্ড ও মুণ্ডকে এই পাহাড়েই বধ করেছিলেন

দুর্গা। মহিষাসুর থেকেই কালে কালে অপভ্রংশে মহীশূরের নাম। সত্যি বলতে, এই মন্দিরে এসেই সম্যক উপলব্ধি হয়েছিল, মহিষাসুর মানেই সিংহের আক্রমণে ত্রস্ত, দেবীর ত্রিশূলে বিদ্ধ কোনও মহিষরূপী দানব নয়। মহিষ রাজা মানে অন্য কিছু।

সেই মহিষাসুরের বর্তমান উত্তরাধিকারীদের খোঁজ নেবার আগে ইতিহাসের পাতায় খানিক চোখ বুলিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। পুঁথি ঘাঁটলে জানা যায়, ১৮৮০ সালে ক্যারন চা-বাগানের পত্তন। সেই সময় রাঁচি ও ছোটনাগপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে কুলির কাজে নিয়ে আসা হয়েছিল অসুরদের। আগে জঙ্গলে শিকারও করতেন ওঁরা। নিজেদের হিন্দু এবং শিবের উপাসক বলে পরিচয় দিতেন। আসলে মহিষাসুরের উত্তরাধিকারী আদিবাসী অসুর এবং শিবপুজো করা রিকাতদের একাকার হওয়াতেই ভারতের ঐতিহ্য।

ক্যারন চা-বাগানের বেশির ভাগ অসুর-ঘরই এখন খ্রিস্টান। যাঁদের বয়স হয়েছে, অনেকে তাঁরা স্মৃতির ঝাঁপি উপুড় করে বলেন, ছোটবেলা থেকেই দুর্গাপুজোটা খুব খারাপ কাটত। চার দিকে আনন্দ-হুল্লোড়, বাড়ির লোক ঘরের বাইরে বেরতে দিত না। বলত, বেরোলেই অমঙ্গল কিছু ঘটবে। এদিকে বন্ধুবান্ধবরাও পদবি নিয়ে ঠাট্টা করে। ফলে অসুরদের মধ্যে অনেকেই টোপ্পো, কুজুর ইত্যাদি পদবি নিয়ে নিয়েছেন। বছরে দু'বার, ফাল্গুন মাসে আর দশেরায় ওঁরা অসুর বাবার পুজো করেন। বহু আগে শিকার করে মাংস খেতেন ওঁদের অনেকে। এখন আর সে দিন নেই। ফলে আর পাঁচটা বাড়ির মতো তেল-হলুদ-সরষে বাটা চলে এসেছে ওঁদের রান্নায়।

কী কী হারিয়ে গিয়েছে সময়ের গর্ভে, তার হিসেব মেলাতে গেলে দেখা যাবে, শুধু রন্ধন বা ধর্মসংস্কৃতি নয়, একশো-দেড়শো বছর ধরে বিভিন্ন চা-বাগান ও খাদানের কুলি লাইনে হতদরিদ্র অভিবাসী হতে হতে অসুররা হারিয়েছেন নিজস্ব ভাষা। ১৮৭২ সালের জনগণনায় ১৮টি জনজাতির কথা বলা হয়েছিল। সবচেয়ে বেশি লোক ছিলেন অসুরদের মধ্যে। ১৭৪ বছর পর সেই অসুররা আজ ঝাড়খণ্ডের এক 'আদিম জনজাতি'। প্রিমিটিভ ট্রাইব। আসুরিসহ প্রায় দেড়শোটি ভারতীয় ভাষা ধ্বংসের মুখে এসে পৌঁছেছে বলে বছর চারেক আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছে 'পিপল'স লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া'। ফলে আমরা বুঝতে পারছি, আমাদের অবহেলায় কীভাবে হারিয়ে যাচ্ছে জনজাতিদের নিজস্ব ভাষা, গান, উপকথার মৌলিক সংস্কৃতি।

এই জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন জাগে, তাহলে ঠিক কী ছিলেন মহিষ রাজা? তিনি কি স্বর্গ-মর্ত ছারখার করে দেওয়া এক ভয়ংকর অসুর, যাঁর হাত থেকে বাঁচতে ব্রহ্মা-বিষ্ণুর মতো দেবতাদের নিজের শক্তি দিয়ে ডাকতে হল মহামায়াকে? নাকি তিনি ছিলেন প্রজাপালক এক নৃপতি, যাঁকে নারীর মোহিনী মায়ায় বশ হয়ে শেষ অবধি মৃত্যুবরণ করতে হল? আর এই অসুরই বা কারা? দেবতাদের স্বর্গরাজ্য বা মুনিঋষিদের তপোবনে সন্ত্রাসের হানা দেয় যারা?

ঋগ্‌বেদ কিন্তু সে কথা বলছে না। মিত্র, বরুণ, অগ্নি, রুদ্র— সব বৈদিক দেবতাই নাকি অসুর। মায় সবিতৃ বা সূর্যদেবও 'সোনালি হাতের দয়ালু অসুর'। ঋগ্‌বেদ জানিয়েই দিয়েছিল, অসুর কোনও ঈশ্বরবিরোধী শয়তান নয়। অসুর হল শক্তিমান এক পুরুষ। এই ক্ষমতাশালী অসুরপুরুষ আসলে বিশ্বস্রষ্টা। পারসি ধর্মের 'জেন্দে আবেস্তা'র একমাত্র ঈশ্বর। আহুর মজদা। ম্যাক্সমুলার থেকে মনিয়ের উইলিয়ামস, অনেকেই ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, আহুর এবং বৈদিক সংস্কৃতির অসুর অনেকটা এক। খ্রিস্টের জন্মের আড়াই থেকে তিন হাজার বছর আগে ইরাকের কাছে যে আসিরীয় সভ্যতা ছিল, সেখানেও ছিলেন এই আহুর মজদা। প্রাচীন শিলালিপিতে কিউনিফর্ম সংকেতে রয়েছে তার উল্লেখ।

সেই শিলালিপিটি এখন রাখা আছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। খ্রিস্টের জন্মের প্রায় ৬০০ বছর আগে আসুরনিপাল আসিরিয়ার রাজা হয়েছিলেন। শিলাপটে তাঁর সিংহ শিকারের কিছু ছবিও আছে। মহিষ রাজার খোঁজে এভাবেই পশ্চিম এশিয়ার প্রত্নতত্ত্বে সিংহ শিকারি এক নৃপতির খোঁজ পেলেন গবেষকরা। ভাষাতত্ত্বের খেলায় প্রাচীন আসিরিয়া, অসুর এবং আহুর মিশে গেল একই অঙ্গে।

অসুররাও দেবতা। রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণ অন্তত সে কথাই বলছে। সেখানে দেবতা ও অসুর দু'পক্ষই প্রজাপতির পুত্র। বৈমাত্রেয় ভাই। ইন্দ্রের শ্বশুরমশাই পুলোমা এক অসুর। ভক্ত প্রহ্লাদও হিরণ্যকশিপু নামে এক অসুরের পুত্র। কশ্যপ ঋষির ছেলে ময়দানব হয়েও দেবতাদের অলকাপুরী নির্মাণ করে। ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের এক প্রাসাদ বানায়। তার বউ এক অপ্সরা, নাম হেমা। দেবাসুরের সংগ্রাম তাই শুধুই যুযুধান দুই সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীসংঘর্ষের কাহিনি নয়। এরা সকলেই আত্মীয়। নিজেদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনও করে তারা।

তপ্ত রোদের টাড়ভূমি নেতারহাটে কখনও গেলে দেখতে পাবেন ওদিকের গ্রামগুলোর নাম বেশ অন্যরকম। ঝোবিপাট, বরপাট, চারুয়াপাট। লাল মাটির দেশে পাট হল উঁচু জায়গা। ওসব দিকে দুর্গাপুজো বা নবরাত্রিতে মহিলারা যে অশৌচ পালন করেন, তাকে মহিষাসুর দশা বলে। দীপাবলিকে ওঁরা বলেন সোহরাই। ওই সময় তাঁরা নাভিতে, বুকে ও নাকে করঞ্জী ফুল লাগান। কেননা ওই তিন জায়গাতেই তাঁদের পূর্বপুরুষ ত্রিশূলবিদ্ধ হয়েছিলেন, রক্ত ঝরেছিল। মাংস বা হাঁড়িয়া খাওয়ার পাশাপাশি শসাও খাওয়া হয়। শসা হল মহিষাসুরকে খুন করা সেই ছলনাময়ী হৃদয়ের প্রতীক।

সবুজ এই পাহাড়ের পাদদেশে এলে শোনা যায় অসুরি উপকথা। সেখানে মহিষাসুর এলাকার রাজা। দেবতার সঙ্গে তার বিশেষ বনে না। দেবতারা তাদের বন্ধু দুর্গার শরণাপন্ন হয়। তারা জানত, রূপযৌবন আর ছলাকলায় দুর্গা সবাইকে ভোলাতে পারে। ফলে মহিষ রাজাকে ফাঁদে ফেলার ষড়যন্ত্র হল। একদিন রাজা তার সঙ্গীদের নিয়ে জঙ্গলে চলেছিল লোহা গলানোর কাজে। সুন্দরী দুর্গা হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকে। কাজ ফেলে মহিষাসুর তার সঙ্গে যায়। এরপর ভেসে যায় আদরের নৌকো। সুন্দরী দুর্গা তার প্রেমিককে নিয়ে কখনও যায় নদীর ধারে, কখনও যায় ভাটিখানায়। মহিষাসুরকে তার অস্ত্রগুলোও মাটিতে পুঁতে ফেলতে বাধ্য করে সে। তারপর এভাবেই একদিন নিরস্ত্র প্রেমিককে মেরে ফেলে।

এখানে শ্রীশ্রীচণ্ডীর কথা মনে পড়তে পারে পাঠকের। সেখানে আছে, দেবী সুরাপান করে আরক্তনয়না। তিনি হেসে অস্পষ্ট বাক্যে অসুরকে বলছেন, আমি পান করি, তুই গর্জন কর। দুর্গা সেখানে শুধুই সংহারমূর্তি ধারণ করেননি। মদ্যপান, আরক্তলোচন, অস্পষ্ট স্বরে জড়িয়ে যাওয়া কথার মোহিনী মূর্তির কথাও বলা হয়েছে সেখানে। সেই মোহিনী এক লাফে মহিষাসুরের উপরে চড়ে বসেছিলেন। তার গলায় পা দিয়ে বুকে বিঁধিয়ে দিয়েছিলেন শূল। শুম্ভ-নিশুম্ভ, রক্তবীজ, ধূম্রলোচন— কোনও অসুরকে মারার সময়েই এভাবে সুরাপানে দেবীর কথা জড়িয়ে যায়নি। লাফ মেরে কারও শরীরে চড়েও বসেননি।

এক-এক জনজাতির এক-এক উপকথা, ঐতিহ্য। কিন্তু সাঁওতাল, মুন্ডা, অসুর— প্রত্যেক জনজাতির মধ্যেই রয়েছে মহিষ রাজা ও ছলনাময়ী এক নারীর উপাখ্যান। জনজাতির উপকথায় এই সুরাপানই হয়ে যেতে পারে হাঁড়িয়া খাওয়া। অসুরের শরীরে চড়ে বসা হয়ে উঠতে পারে প্রেম ও প্যাশন মেশানো রোমাঞ্চকর এক খুনের চরম মুহূর্ত। কিন্তু জনজাতির ইতিহাস তো আর পুরাণ রচনা করে না। তারা পরাজিত। যারা বিজয়ী, তারাই ইতিহাস লেখে। রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী— সবই আসলে বিজয়ীদের ব্যাখ্যা।

(ঋণ— গৌতম চক্রবর্তী, ডঃ নজরুল ইসলাম)

শিশুদের মধ্যে নাটক বিস্তারে কাজে নেমেছে শিশু নাট্যম

শিলিগুড়িতে শিশুদের নাটক নিয়ে দিনের পর দিন কাজ চালিয়ে যাওয়া শিশু নাট্যম তাদের পঁচিশ বছর পূর্তিতে সারা বছর ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান কর্মসূচি নিয়েছে।

শিশুদের মধ্যে মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ তথা সমাজচেতনা, সর্বোপরি জাতীয় সংহতির চেতনা আনতে আগামী এক বছর ধরে শিলিগুড়িসহ উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন নাট্য ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি নেওয়া শুরু করল শিশু নাট্যম নামে একটি সংস্থা। সম্প্রতি শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে এই বর্ষব্যাপী নাট্য ও সংস্কৃতি উৎসবের সূচনা হয়। শিশু নাট্যমের তরফে নাট্যকার দীপোজ্জ্বল চৌধুরী বলেন, পঁচিশ বছর ধরে তাঁরা শিলিগুড়িতে শিশুদের নিয়ে কাজ করছেন।

শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে শিশুদের যেসব নাটক পরিবেশিত হয়, তার মধ্যে আছে 'বাহাদুর ছেলে'। কলকাতার 'এসো নাটক শিখি'র শিশুশিল্পীরা নাটক পরিবেশন করে। তাপস দাসের পরিচালনায় সেই নাটক পরিবেশিত হয়। শিলিগুড়ির বনমালা পরিবেশন করে 'প্রশ্ন'। তার বাইরে 'খরগোশের ছোট্ট বন্ধুরা' মঞ্চস্থ হয়। শিলিগুড়ির অনেক নাট্যব্যক্তিত্ব ও রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আধিকারিক জগদীশ রায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নাট্যকার পার্থ চৌধুরী, কুন্তল ঘোষ সকলেই এই প্রয়াসের প্রশংসা করেন। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আধিকারিক জগদীশ রায় বলেন, তাঁরা চাইছেন, শিশুদের মধ্যে নাটক ও সুস্থ সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ুক। সেখানে নাট্যকার দীপোজ্জ্বলবাবু জানান, সারা বছর ধরে শিশুদের যুক্ত করে তাঁরা বিভিন্ন কর্মসূচি নিচ্ছেন উত্তরবঙ্গ জুড়ে। তাঁরা শিশুনাটকের উপর কর্মশালা করছেন। নাটক প্রতিযোগিতাও করবেন। হবে শ্রুতিনাটক উৎসব। এক হাজারেরও বেশি শিশুকে এইসব অনুষ্ঠানে শামিল করেছেন তাঁরা। শিশু নাট্যমের পঁচিশ বছর ধরেই তাঁদের এই প্রয়াস। শিশুসাহিত্য বিষয়ক শিবিরও হবে। বিভিন্ন ভাষায় শিশুনাটক করা যায় কি না, তারও প্রয়াস নেওয়া শুরু হয়েছে। শিশু চলচ্চিত্র উৎসব এবং চিত্রাঙ্কনের আয়োজন করছেন তাঁরা। চারদিকে সুস্থ সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিতেই তাঁদের এই প্রয়াস। পঁচিশ বছরে পাঁচশোরও বেশি নাট্যকর্মী তৈরি করেছে শিশু নাট্যম। শৈশব থেকে নাটক শিখে আন্তা কুমারী এখন শিলিগুড়ি কলেজে পড়ান। তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় দীনবন্ধু মঞ্চে। সেই অনুষ্ঠানে ফুলেশ্বরী নন্দিনীর তরফে সুহাস বসুও উপস্থিত ছিলেন। তিনি শিশুদের মধ্যে নাট্যচর্চা বাড়াতে ওই প্রয়াসের প্রশংসা করেন। সেপ্টেম্বরের শুরুতে এরই অঙ্গ হিসাবে তাঁরা শিলিগুড়ি আনন্দময়ী কালীবাড়িতে শিশুদের নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করছেন বলে দীপোজ্জ্বলবাবু জানিয়েছেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি

শিলিগুড়ির প্রাচীন স্কুলে এখন বস্তির শিশুদের রবীন্দ্রসংগীত শেখানো হচ্ছে

শিলিগুড়িসহ উত্তরবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে একসময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ডিআই ফান্ডের একটি স্কুল। সেই প্রাচীন স্কুলে এখন বস্তির শিশুদের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন বিভাগ এবং সর্বশিক্ষা মিশন ওই স্কুলের উন্নয়নে কিছু কাজ শুরু করেছে।

১৮৯০ সালে শিলিগুড়ির প্রথম তথা প্রাচীনতম স্কুলটি তৈরি হয়। নাম পাবলিক প্রাইমারি স্কুল। ফাদার শশিভূষণ চক্রবর্তী নামে এক ধর্মান্তরিত বাঙালি ব্রাহ্মণ খ্রিস্টান পাদরি স্কুলটি তৈরি করতে উদ্যোগ নেন। শিলিগুড়ির কৃতী সন্তান অবনীনাথ ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রনাথ রায় সরকার, ডাক্তার কেএন ভৌমিক বা কালু ডাক্তার এই স্কুলেই পড়েছেন। ক'বছর আগেও এই স্কুলে কোনও সীমানা প্রাচীর ছিল না। সবই ছিল কাঠের তৈরি। পাঁচ বছর আগে ভূমিকম্পের জেরে স্কুলের বেশ ক্ষতি হয়। তারপর সর্বশিক্ষা মিশনের সাহায্যে ১৩ লক্ষ টাকা খরচ করে স্কুলভবন পাকা করা হয়। বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকেও স্কুলের অনেক উন্নতি হয়েছে। যদিও স্কুলে এখনও অনেক সমস্যা। স্কুলের গায়েই ডিআই ফান্ড হাট। সেই হাটের আবর্জনা স্কুলের সামনে প্রায়ই জমে থাকে। স্কুলের সামনে নর্দমা নিয়মিত পরিষ্কার না হওয়াতে তাতে জল

জমে মশার উৎপাত বাড়ছে। স্কুল গেটের সামনের গেটে মুড়ির হাটও বসে। প্রাচীন ঐতিহ্যময় স্কুল হলেও স্কুলের বোর্ডটিকে টাঙানো যায়নি, তা স্কুলের মধ্যেই কোনওমতে পড়ে আছে। অভাব অর্থের। স্কুল ভবনের রং করানো প্রয়োজন। স্কুলে এখন তিনজন শিক্ষক। একজন প্যারা টিচার। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৮৭। অথচ ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা শম্পা চক্রবর্তী জানালেন, কয়েক বছর আগেও স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩৫০। এখন পঞ্চম শ্রেণিতে লটারিতে ভরতি প্রক্রিয়া শুরু হওয়াতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমতে থাকে। স্থানীয় বস্তির ছেলেমেয়েরা এখন পড়তে আসে। টিচার-ইন-চার্জ শম্পাদেবী জানালেন, মিডডে মিলের জন্য যেমন কিছু ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়তে আসে, তেমনই তাঁরা ছাত্রছাত্রী ধরে রাখতে স্কুলে মিউজিক সিস্টেম বসিয়েছেন। নাচের শিক্ষক এনে স্কুলে নাচ শেখানোর চেষ্টা হচ্ছে। মিউজিক সিস্টেমে রোজই রবীন্দ্রসংগীত হয়। সেই সংগীতে বস্তির শিশু ছাত্রছাত্রীরা রোজই গলা মিলিয়ে চলেছে। তারা পড়ার পাশাপাশি রবীন্দ্রসংগীত গাইছে স্কুলে। তার সঙ্গে ক্যারম, বাগাডুলি, চাইনিজ চেকারের মতো ইনডোর গেমসের ব্যবস্থা হচ্ছে। তবে বুধবার স্কুলের সামনে হাট বসলে হাটে কাজ করে স্কুলের অনেক ছাত্র। সে দিন তারা স্কুলে আসে না। এইসব ছাত্রছাত্রীর কারও বাবা নেই, কারও মা নেই। কেউ আবার স্কুলের পর কাজ করে। কারও দাদু-দিদিমা শিলিগুড়ির রাস্তায় ভিক্ষা করে নাতিনাতনিকে ওই স্কুলে পড়াচ্ছেন। হাটবারে অনেক ছাত্র স্কুল ছুটির পর হাটের বিভিন্ন প্যাকেটসহ অন্য জিনিস সরিয়ে দুটো পয়সা রোজগারে নামে। স্কুলের শিক্ষক বিপ্লবকুমার ঘোষ মৌলিক, ননীগোপাল ঘোষ জানালেন, তাঁরা মিউজিক সিস্টেমের মাধ্যমে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বাগ্মিতা শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করছেন। আর সীমা বিশ্বাস, ঝুলন বারুইয়ের মতো পিছিয়ে পড়া শিশুরা শহরের প্রাচীনতম এই স্কুলে পড়ে নিজেদের গান ও নাচের প্রতিভা বিকাশের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ছোট থেকেই।

নিজস্ব প্রতিনিধি

ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা

শিশু কিশোর আকাদেমির উদ্যোগে গোটা রাজ্যের সঙ্গে কোচবিহারেও হয়ে গেল ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা। গত ২০ অগাস্ট স্থানীয় মহারানি ইন্দিরাদেবী বালিকা বিদ্যালয়ে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ দ্বারা আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ৫ থেকে ১০ বছর বয়স পর্যন্ত 'ক' বিভাগের বিষয় ছিল 'আমার দেশ'। ১১ থেকে ১৬

বছরের 'খ' বিভাগের বিষয় ছিল 'একতাই সম্প্রীতি'। এই অঙ্কন প্রতিযোগিতায় জেলার বিভিন্ন স্কুল থেকে ১৪০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন কোচবিহারের দুই বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী রশিদ খান এবং সৌভিক ভৌমিক। 'ক' বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে জয়া চক্রবর্তী, ইমনজিৎ সাহা ও অনিকেত দাস এবং 'খ' বিভাগে অর্কদ্যুতি দাস, সুরজিৎ রায় ও দেবস্মিতা শীল যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

'মুজনাই' পত্রিকার উদ্যোগ

'মুজনাই' সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে কোচবিহারের শতবর্ষপ্রাচীন সাহিত্যসভায় কবিগুরুর প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হল 'স্মরণে বাইশে শ্রাবণ'। অনুষ্ঠানে উদ্‌বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বাপি সূত্রধর। 'রবীন্দ্রনাথ ও সাম্প্রদায়িকতা' বিষয়ে আলোচনা করেন কবি ও সংগীতশিল্পী মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস, অধ্যাপক ডঃ আলোক সাহা এবং 'তিতির' পত্রিকার সম্পাদক সঞ্জয় সাহা। প্রত্যেকেই সহমত হলেন যে, আজকের অস্থির বাতাবরণে রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা প্রকৃত সহিষ্ণুতা আনতে পারে, তাঁর জীবনদর্শনই বিরাট শিক্ষা।

অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন বাসবদত্তা চক্রবর্তী, অরুন্ধতী নিয়োগী ও নাট্যব্যক্তিত্ব দীপায়ন ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের আর-এক আকর্ষণ ছিল 'মুজনাই'-এর সম্পাদক শৌভিক রায়ের সাম্প্রতিকতম কবিতা ও ছবির বই 'ডুয়ার্সের নোটবুক' প্রকাশ। সব শেষে কবিতা পাঠ করলেন অজিত অধিকারী, বিবেক চৌধুরী, সুবীর সরকার প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন ডঃ অনিরুদ্ধ বর্মন, রঞ্জন ভট্টাচার্য, কিশোরনাথ চক্রবর্তী, রূপক সান্যাল, চৈতালী ধরিত্রীকন্যা-সহ বিশিষ্টজনরা।

নিজস্ব প্রতিনিধি

গল্পপাঠের আসর

জলপাইগুড়ি শহরের পাঁচ গল্পকারের একান্ত প্রয়াসে এক বছর আগে শুরু হয়েছিল গল্পপাঠের আসর। সেই আসরের এক বছর পূর্ণ হল অগাস্ট মাসে। সেই বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গত ২০ অগাস্ট বিশেষ গল্পপাঠের আসরের আয়োজন হল শহর জলপাইগুড়িতে। শহরের সুভাষ ফাউন্ডেশন ভবনে আয়োজিত এই আসরে উপস্থিত থেকে স্বরচিত গল্প পাঠ করলেন মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য, হিমি মিত্র রায়, তনুশ্রী পাল, মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস, রুমি নাহা, দেবযানী সেনগুপ্ত-সহ শিলিগুড়ি থেকে আসা বিশিষ্ট সাহিত্যিক সেমন্তী ঘোষ, সুতপা সাহা প্রমুখ। গল্প লেখা নিয়ে আলোচনা করেন প্রবীণ সাহিত্যিক বিপুলকুমার মিত্র।

নিজস্ব প্রতিনিধি

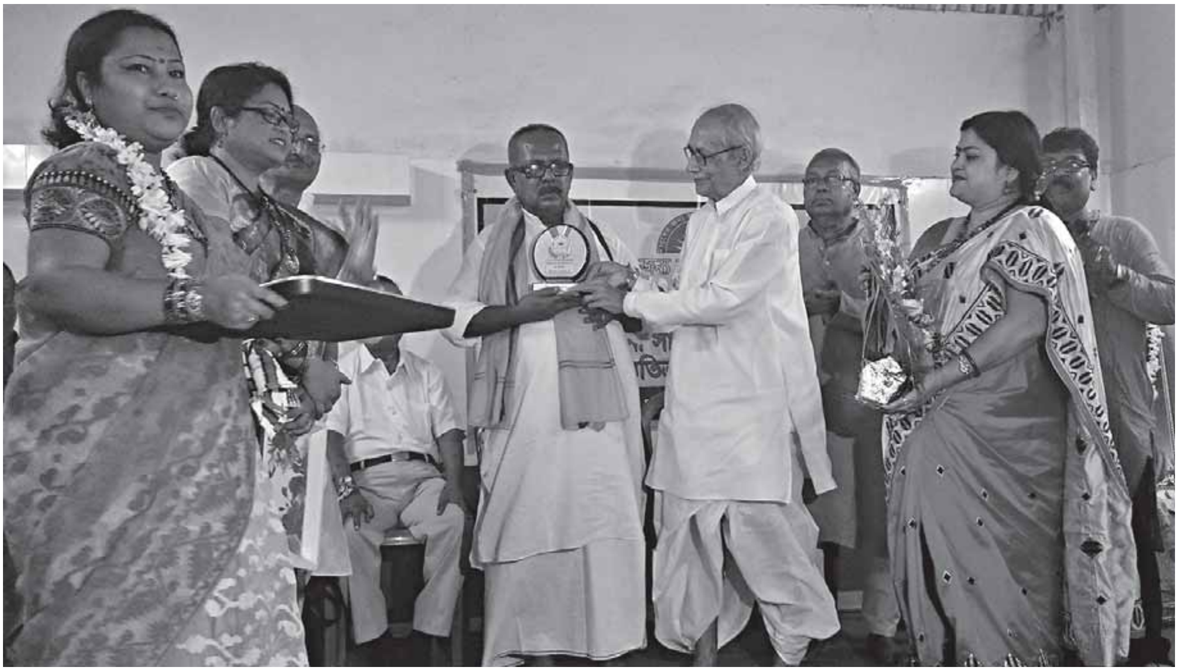

সংঘ সংস্কৃতির ডুয়ার্স

সংবর্ধিত লেখক গৌরীশংকর

শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের ভ্রমণ লেখক গৌরীশংকর ভট্টাচার্য সংবর্ধিত হলেন। উত্তরবঙ্গের পাহাড় থেকে তরাই জঙ্গলে তিনি বহুদিন ঘুরে বেড়ান। এভাবেই তিনি নতুন নতুন টুরিস্ট স্পট আবিষ্কার করেন। আর তা নিয়ে লেখালেখি করেন বিভিন্ন পত্রিকায়। বয়স হলেও তাঁর লেখালেখিতে কোনও বিরাম নেই। সবুজ উত্তরবঙ্গকে মেলে ধরতে তাঁর সবুজ মনের কোনও তুলনা নেই এই বৃদ্ধ বয়সেও। এই বিশিষ্ট লেখক গৌরীশংকর ভট্টাচার্যকে সংবর্ধনা দেওয়া হল শিলিগুড়ি সুভাষ পল্লির ভিবজিওর ক্লাবে। ফুলেশ্বরী নন্দিনী নামক সংস্থার উদ্যোগে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় গত ৭ অগাস্ট।

শিলিগুড়ি ও তার আশপাশে সংস্কৃতির বিকাশে ফুলেশ্বরী নন্দিনী বেশ কিছুদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সংগীতের পাশাপাশি সাহিত্যের আড্ডাও চালিয়ে যাচ্ছে এই সংস্থা। সংস্থার সম্পাদিকা কণিকা দাস। প্রতি মাসের একটি রবিবারে ওই ক্লাবে তাদের সাহিত্য আসর বসে। গত ৭ অগাস্ট বিশ্বকবির তিরোধান দিবসে ওই সংস্থার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ছিল। আর সে উপলক্ষেই সারাদিন ধরে নানান অনুষ্ঠান হয়। বর্ষপূর্তি পালনের আগের দিন টিকিয়াপাড়ার অনাথ আশ্রমে অনাথদের হাতে রাখি পরিয়ে উপহার হিসাবে খাতা-কলম তুলে দেন নন্দিনীর নন্দিনীরা। আর ৭ অগস্ট বর্ষপূর্তি পালনের দিন সকালে প্রেস ক্লাবে প্রথমে বৃক্ষরোপণ হয়। তারপর বিকেল হতে না হতেই ভিবজিওর ক্লাব চত্বরে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কবি, লেখক, সাহিত্যিকদের সমাবেশ ঘটে। উপস্থিত হন বিশিষ্ট গবেষক ডঃ গৌরমোহন রায়, আকাশবাণী শিলিগুড়ির প্রাক্তন অধিকর্তা শ্রীপদ দাস, বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ব্যোমকেশ ঘোষ, লেখক নানক ভট্টাচার্য, প্রবীণ সাংবাদিক বিপ্লব ঘোষাল, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতির স্থানীয় আহ্বায়ক সজলকুমার গুহ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে এ বছরে মাধ্যমিক পরীক্ষার কৃতী ছাত্র জয়ন্ত কুমারকে সাহায্য করা হয়। দিনমজুরের ছেলে জয়ন্ত এবার মাধ্যমিকে প্রতিটি বিষয়ে লেটার নিয়ে পাশ করেছে। ফুলেশ্বরী নন্দিনীর তরফে সভাপতি সুহাস বসু, সম্পাদিকা নন্দিনী দাস তার হাতে অর্থসাহায্য তুলে দিয়ে সংবর্ধনা দেন। সংগীতশিল্পী শিল্পী পালিত ও তাঁর স্বামী কাঞ্চন পালিত জয়ন্তকে নগদ এক হাজার টাকা অর্থসাহায্য তুলে দেন। কাঞ্চনবাবু জয়ন্তকে একটি স্কুল ব্যাগ উপহার হিসাবে তুলে দেন। গবেষক ডঃ গৌরমোহন রায় জয়ন্তকে পাঁচশো টাকা দিয়ে আরও সাহায্যর আশ্বাস দেন। ফুলেশ্বরী নন্দিনী বিভিন্ন সামাজিক কাজও যে করছে, তার প্রমাণ হয় এই সাহায্য থেকে।

ফুলেশ্বরী নন্দিনী তাদের নিয়মিত সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশ করছে। সে দিন কবিগুরুর প্রয়াণ দিবসে কবিকে স্মরণ করে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সভাপতি সুহাসবাবু বলেন, আগামী দিনে তাঁরা আরও এ ধরনের কাজ করে যাবেন।

আসন্ন শারদীয়া দুর্গোৎসবকে স্মরণ করে ফুলেশ্বরী নন্দিনী বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠান করতে চলেছে 'মহিষাসুরমর্দিনী'র উপর। আনন্দময়ী কালীবাড়িতে তাদের মহালয়ার দিন অনুষ্ঠান রয়েছে 'মহিষাসুরমর্দিনী'র উপর। স্বাধীনতা দিবসের দিনও শিলিগুড়ির হায়দরপাড়ায় কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে হওয়া অনুষ্ঠানে ফুলেশ্বরী নন্দিনী তাদের দেশাত্মবোধক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। তবে সে দিনের বর্ষপূর্তিতে লেখক গৌরীশংকর ভট্টাচার্যর সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সকলের নজর কাড়ে। অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসা অনেকেই বলতে থাকেন, গৌরীশংকরবাবু দিনের পর দিন যেভাবে লেখালেখি করে চলেছেন ভ্রমণের উপর, তার তুলনা হয় না। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি অনবরত লিখে চলেছেন। কাজেই তাঁকে সংবর্ধনা দিয়ে ফুলেশ্বরী নন্দিনী বিরাট কাজ করল।

বাপি ঘোষ

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস

চিত্রকথা 'ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস'। পর্ব-১৭। এই চিত্রকথা কোনওভাবেই ছোটদের জন্য নয়। আর কাহিনির সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজতে যাওয়া অনভিপ্রেত।

কাহিনি : বৈকুণ্ঠ মল্লিক, ছবি : দেবরাজ কর

EKHON DUARS, Vol-4, Issue-11 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

ছবি: রাহুল সিং, জলপাইগুড়ি ফোটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.